سورة التوبة مدنية وهي مائة وتسع وعشرون آية وست عشرة ركوعا

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ①
فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ
وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ② وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬ وَ
رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ
غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ③ اِلَّا
الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ
يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ④ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ
وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ
اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤ وَاِنْ
اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ
اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ⑥

সূরা আত্-তাওবাহ
মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১২৯

(১) সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (২) অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। (৩) আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা, তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্কে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৪) তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।

সূরা আত্-তাওবাহ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে সূরা বরাআতের শুরু। একে সূরা 'তওবাও' বলা হয়। বরাআত বলা হয় এ জন্য যে, এতে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর 'তওবা' বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে— (মাযহারী)। সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কোরআন মজীদে এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' লেখা হয় না, অথচ অন্যান্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখা হয়। এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিখিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের আগে মনে রাখা আবশ্যক যে, কোরআন মজীদ তেইশ বছরের দীর্ঘ পরিসরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। এমনকি একই সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। হযরত জিব্রীলে আমীন 'ওহী' নিয়ে আসলে আল্লাহ্র আদেশ মতে কোন্ সূরার কোন আয়াতের পর অন্য আয়াতকে স্থান দিতে হবে তাও বলে যেতেন। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহী লেখকদের দ্বারা তা' লিখিয়ে নিতেন।

একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' নাযিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হল, অতঃপর অপর সূরা শুরু হল। কোরআন মজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ্ নাযিল হয় আর না রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা লিখে নেয়ার জন্য ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়।

কোরআন সংগ্রাহক হযরত ওসমান গনী (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোন সূরা নয় বরং অন্য কোন সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন্ সূরার অংশ হতে পারে? বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আন্ফালের অংশ বলাই সংগত।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা মিলিত সূরা বলা হত (মাযহারী)। সেজন্য একে সূরা আন্ফালের পর স্থান হয়। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আন্ফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কোরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আন্ফালের শেষে এবং সূরা তওবা শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্'-এর স্থান হয়।

সূরা বরাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিখিত না হওয়ার এ তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে ইমাম আহমদের স্বয়ং হযরত ওসমান গনী (রাঃ) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, যে নিয়মে কোরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয়, অর্থাৎ, প্রথম দিকে শতাধিক আয়াতসম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়—পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'মি-ঈন', অতঃপর রাখা হয় শতের কম

াত সম্বলিত সূরাগুলো—যাদের বলা হয় 'মাসানী'। এর পর স্থান দেয়া ছোট সূরাগুলোকে—যাদের বলা হয় 'মুফাচ্ছালাত'। কোরআন লনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আন্‌ফালের আগে স্থান া কি উচিত ছিল না? কারণ, সূরা তওবার আয়াতসংখ্যা শতের ক। আর আন্‌ফালের শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে যাদের سبع طوال বলা হয়; নুসারে আন্‌ফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ নে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি?

হযরত উসমান গনী (রাঃ) বলেন, কথাগুলো সত্য, কিন্তু কোরআনের লায় যা করা হল, তা' সাবধানতার খাতিরে। কারণ, বাস্তবে সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, নফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই হীর ইঙ্গিত ব্যতীত আন্‌ফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেয়া আমাদের ক বৈধ হবে না। আর একথাও সত্য যে, ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন হেদায়েত আসেনি। তাই আন্‌ফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আন্‌ফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোন সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা। এ কারণেই আমাদের মান্য ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আন্‌ফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করে, কিংবা এর মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, সে বিসমিল্লাহ্ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তেলাওয়াত কালে কোন অবস্থায়ই বিসমিল্লাহ্ পাঠ জায়েয নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু, এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ্ এর স্থলে اعوذ بالله من النار তারা পাঠ করে.। এর কোন প্রমাণ হুযূর (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহ্‌তে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সূরা তওবায় কাফেরদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থী নয়। মূল কারণ হল, তওবা ও আন্‌ফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হাঁ, উপরোক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে এ সূরায় কাফেরদের নিরাপত্তাকে নাকচ করে দেয়া হয় বিধায় 'বিসমিল্লাহ্' সঙ্গত নয়।

সূরা তওবার উপরোক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ধির জন্যে যে ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেয়া আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেয়া হল।

(১) সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হোনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হল অষ্টম হিজরী সালের মক্কা বিজয় অতঃপর এ বছরেই সংগঠিত হয় হোনাইন যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরীর রজব মাসে। তারপর এ সালের জিলহজ্ব মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেয়া হয়।

(২) চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলোর আয়াতে উল্লেখিত আছে, তার সারমর্ম হল, ষষ্ঠ হিজরী সালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত (সাঃ)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এর মেয়াদকাল ছিল তফসীরে 'রূহুল-মা'আনী'র বর্ণনা মতে, দশ বছর। মক্কার কোরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের মিত্র অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিত্র হয়ে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে 'খোযাআ' গোত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এবং বনু-বকর গোত্র কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হল, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তিভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গত বছরের ওমরা কাযা করার উদ্দেশে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিন দিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মোতাবেক মদীনা প্রত্যার্বন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনু-বকর গোত্র বনু খোযা আর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কোরাইশগণ মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থান বহুদূরে, তদুপরি এ'হল নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছিবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনু-বকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে যা কোরাইয়েশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল। অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি।

ওদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিত্র বনু-খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌছে দেয়। তিনি কোরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহোদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবী সাহায্য লাভের বিষয়টি কোরইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তি ভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়ে গেল। চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ হযরতের কাছে পৌছার পর পূর্ণনীরবতা লক্ষ্য করে এ আশঙ্কা আরো ঘনীভূত হল। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করে। যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবু সুফিয়ান মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত (সাঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন, এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা হযরত (সাঃ)-এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবু সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়-ভীতি

ছড়িয়ে পড়ে।

'বিদায়া' ও 'ইবনে-কাসীর' এর বর্ণনা মতে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অষ্টম হিজরীর দশই রমযান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা জয়ের উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

সূরার তৃতীয় আয়াত يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ বাক্যের অর্থ নিয়ে মুফাস্সেরগণের মধ্যে মতবেধ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত ওমর ফারূক (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের প্রমুখ সাহাবা বলেন ঃ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ এর অর্থ—আরাফাতের দিন। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন। الحج عرفة "হজ্ব হল আরাফাতের দিন"— (আবু দাউদ)। আর কেউ বলেন, এর অর্থ কোরবানীর দিন বা দশই যিলহজ্ব।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) এবং অপরাপর ইমামগণ এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধন উদ্দেশে বলেন, হজ্বের পাঁচ দিন হল হজ্বে আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কোরবানীর দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে يَوْمَ (দিন) শব্দের একবচন আরবী বাকরীতির বিরুদ্ধ নয়। কোরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে يَوْمَ الْفُرْقَانِ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা يوم أحد يوم بعاث প্রভৃতিতে একবচন রয়েছে। রয়েছে অনেক দিনব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা'ছাড়া ওমরার অপর নাম হল হজ্বে-আসগর বা ছোট হজ্ব। এর থেকে হজ্বকে পৃথক করার জন্যে বলা হয় হজ্বে-আকবর অর্থাৎ, বড় হজ্ব। তাই কোরআনের পরিভাষা মতে, প্রতি বছরের হজ্বকে হজ্বে-আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার, সে বছরের হজ্ব হল হজ্বে-আকবর-তাদের এই ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, হযরত (সাঃ)-এর বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবতঃ এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন, হজ্বের দিনগুলোকে 'হজ্বে-আকবর' নামে অভিহিত করা থেকে এ মাসআলাটি বের হয় যে, হজ্বের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা, কোরআন মজীদ এ দিনগুলোকে হজ্বে-আকবরের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছে।

সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কাবিজয়ের পর মক্কা ও তার আশ-পাশের সকল কাফের-মুশরিকের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের বিষয়টি উল্লেখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোন চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষার জন্যে এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোন মেয়াদী চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, তড়িৎ মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা চলে যেতে পারে অথবা, এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহ্র এ সকল আদেশের উদ্দেশ হল, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তবে এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে নেয়া হয়, সেহেতু তাদের সংশোধন ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা রাখা হয়।

ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ পেশ করা আলেমগণের কর্তব্য ঃ

প্রথমত ঃ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল জানতে চায়, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাসিলের জন্যে যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তফসীরে-কুরতুবীতে আছে ঃ এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন আল্লাহ্র কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশে হয়। ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্যে যদি আসতে চায়, তবে তা' মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকগণের বিচেনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেয়া যায় না ঃ

তৃতীয়ত ঃ বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেয়া যাবে না। কারণ, এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশে বলা হয়েছে যে, حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ অর্থাৎ, এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহ্র কালাম শুনতে পায়।

চতুর্থত ঃ মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোন অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যর্পণ করা।

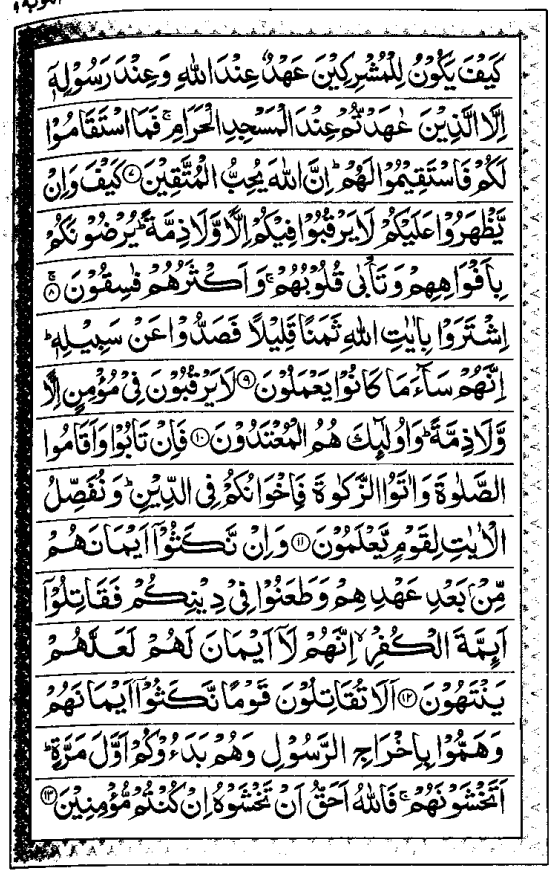

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِن
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم
بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾
اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا
وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم
مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ
أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

(৭) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ্‌র নিকটও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৮) কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (৯) তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট। (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী। (১১) অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি। (১২) আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। (১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্—যদি তোমরা মুমিন হও।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা ঃ কোরআন মজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্যসংখ্য মুশরিক ছাড়া বাকী সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণতঃ এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোশ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যা গুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কোরআন إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল-হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভংগ করেনি, এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভংগ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয় ঃ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।" অর্থাৎ, এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রচিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কোরআন মজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا "কোন জাতির শত্রুতা যেন কে-ইনসাফ হতে তাহাদের উদ্বুদ্ধ না করে" ।-(মায়েদাহ)

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের মর্মপীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে মুসলমানদেরও হুশিয়ার করা হয় যে, ওরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান ! তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হল দুনিয়াপ্রীতি। মূলতঃ দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। তাই এরা আল্লাহর আদেশাবলী ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই পুঁতিগন্ধময়।

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হয়। لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তা নয়; বরং তারা যে কোন অমুসলমানের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে।

মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্যে তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। কোরআন যে আদর্শ ও ন্যায়-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলমানদের হেদায়েত দেয় ঃ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ - "তবে, তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয়, তখন আল্লাহ্ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবী পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব লাভের তিনটি শর্ত ঃ এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম, কুফর ও

শিরক থেকে তওবা। দ্বিতীয় নামায, তৃতীয় যাকাত। কারণ, ঈমান ও তওবা হল গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়; নামায ও যাকাত।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ, যারা নিয়মিত নামায ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য; তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফেকী যাই থাক না কেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্রধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। – (ইবনে কাসীর)

একাদশ আয়াতের শেষ চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশে সংশ্লিষ্ট আদেশাবলী পালনের তাগিদ দিয়ে বলা হয়ঃ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ "আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।"

ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ায় মক্কার যে কোরাইশদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার শুরুর আয়াগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধিচুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামায ও যাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়া ও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল; তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। এরশাদ হয়ঃ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ অর্থাৎ, "এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।"

فقاتلوهم লক্ষ্যণীয় যে, এখানে আপাতঃদৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল, 'সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।' কিন্তু তা না বলে বলা হয় فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ "সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।" তার কারণ, এরা চুক্তিভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রধানে পরিণত হয়ে যুদ্ধের উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার ঐ সকল কোরাইশ-প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ-প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষতঃ এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্যে দেয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হল এরা। তা'ছাড়া, এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে এরা হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে বসতো।—(মাযহারী)

وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ "এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে" বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহ বৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রূপ হল তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামী আইন-কানুনের গবেষণার উদ্দেশে কৃত সমালোচনা বিদ্রূপের শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রূপ বলা যায় না। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম যিম্মীদের তত্ত্বগত সমালোচনার অনুমতি দেয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুমতি দেয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হল اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ অর্থাৎ 'এদের কোন শপথ নেই ; কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোন মূল্য-মান নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হল لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ "যাতে তারা ফিরে আসে।" এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির মত শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ -স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কগণের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ
يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ
تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ
شٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَ
فِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ
فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ
الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ
اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ
اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

(১৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন (১৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (১৮) নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত ; আর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহ্র রাহে, এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। (২০) যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে; নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে আর তারাইসফলকাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিজেদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের জেহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরোক্ত আয়াতসমূহে জেহাদের তাগিদের সাথে রয়েছে এর তাৎপর্য। অর্থাৎ, জেহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানসম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শোনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ্ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহ্র রাহে জেহাদকারী এবং কারা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ইতস্ততঃকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দু' টি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুই আলামত ঃ প্রথম, শুধু আল্লাহ্র জন্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয়, কোন অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয়- وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ "আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্মন্ধে সবিশেষ অবহিত"। তাই তাঁর কাছে কোন হীলা-বাহানা চলবে না।

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েয নয় ঃ ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লেখিত শব্দ وَلِيْجَةً - এর অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে بِطَانَةً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কাপড়ের ঐ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভিতরে পেট বা শরীরের স্পর্শে থাকে। আয়াতটি হল —

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংসসাধনে কোন ত্রুটি বাকী রাখবে না।"

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে মসজিদুল-হারাম ও অন্যান্য মসজিদগুলোকে বাতিল উপাসনা থেকে পবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবুলযোগ্য তরীকায় এবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে।

কতিপয় মাসায়েল ঃ আয়াতে বলা হয় যে, মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফেরদের নেই। অর্থ হল, কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কোন কাফেরকে কোন ইসলামী ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েয নয়। তবে নির্মাণকাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই। - (তফসীরে-মুরাগী)

কোন অ-মুসলিম যদি সওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয়, তবে কোন প্রকার দ্বীনি বা দুনিয়াবী ক্ষতি সেটার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেয়ার আশংকা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে। - (শামী)

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়, আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন নেক্‌কার মুসলমানদের। এর থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকর বা দ্বীনি এলমের শিক্ষা দানে, কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশে মসজিদে যাতায়াত করে, তা'তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে-মাজা শরীফে বর্ণিত আছে ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে দেখ, তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কারণ, আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ "আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো আবাদ করে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি.....।"

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে; নবীয়ে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতে একটি মাকাম প্রস্তুত করেন"। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন; "মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যেয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হল মেহমানের সম্মান করা"। —(মাযহারী, তাবরানী, ইবনে-জরীর ও বায়হাকী শরীফ প্রভৃতি)

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ করার শামিল। যেমন, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়, দুনিয়াবী কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হুল্লোড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাজ। - (মাযহারী)

১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা হল- মক্কার অনেক মুসরিক মুসলমানদের মোকাবেলায় গর্ব সহকারে বলত, মসজিদুল-হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোন আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়গণ তাঁকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল থাকায় বিদ্রূপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত (দেশত্যাগ)-কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। তফসীরে ইবনে-কাসীরে আছে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

মুসনাদে আবদুর রাযযাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে ফযীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ্ শরীফের চাবি আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরেও রাত্রিযাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস বললেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল-হারামের শাসনক্ষমতা, আমার নিয়ন্ত্রণে। হযরত আলী (রাঃ) অতঃপর বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হল, আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে করে নামায আদায় করছি এবং রসূলুল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। যাতে স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোন আমল—তা' যত বড় হোক—আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় অনুরূপ আমলকারী আল্লাহ্‌র মকবুল বন্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন-রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুমআর দিন তিনি কতিপয় সাহাবার সাথে মসজিদে নববী (সাঃ)-তে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ্‌র মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুমআর নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথামত প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জেহাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলতঃ মুশরিকদের অহঙ্কার নিবারণ উদ্দেশে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়।

সে যাহোক, উপরোক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হল, শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবুলযোগ্য নয় এবং এর কোন মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোন মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবেলায় ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না.। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জেহাদের মর্যাদা মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জেহাদে অগ্রগামী, সে জেহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

আয়াতের শেষ বাক্য হল- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "আর আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।" অর্থাৎ,ঈমান যে সকল আমলের মূল ও সকল এবাদত থেকে আফযল এবং জেহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা' কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিষ্কার কথা। কিন্তু আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়েত ও উপলব্ধি শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিংশতিতম আয়াতে তার উপরের আয়াতে উল্লেখিত শব্দ لَا يَسْتَوُونَ 'সমান নয়' এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এরশাদ হয় الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .... "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম"। পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ্ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানগণ এ সফলতার অংশীদার, কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণের সফলতা সবার উর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হল তারা।

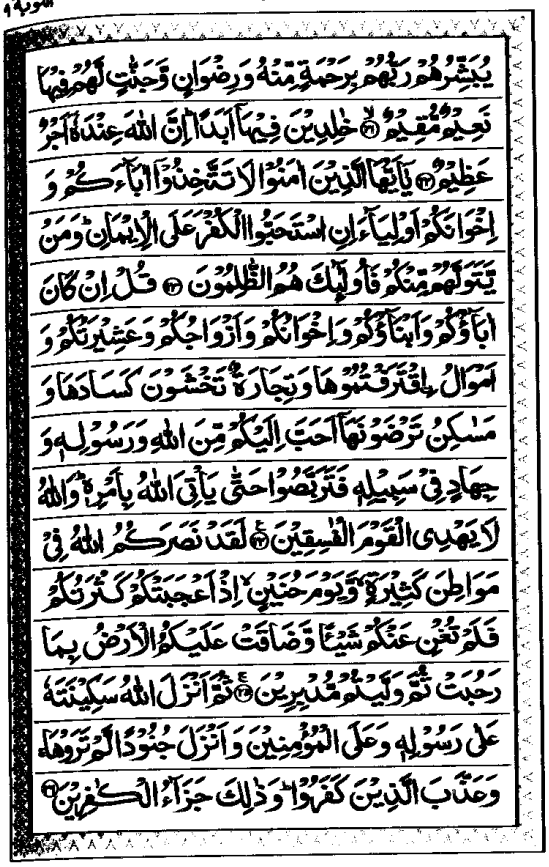

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ
إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِن كَانَ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ
أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ
مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي
مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

(২১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। (২২) তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহা পুরস্কার। (২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী। (২৪) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ কর—আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (২৫) আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (২৬) তারপর আল্লাহ্ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

২১তম ও ২২তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। এরশাদ হয় : يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ .... "তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার।"

উপরোক্ত আয়াতে হিজরত ও জেহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হল মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জেহাদের জন্যে মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। এরশাদ হয়ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ ...... "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী।"

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দুসম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় : উল্লেখিত পাঁচটি আয়াত থেকে আরও কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। **প্রথমতঃ** ঈমান হল আমলের প্রাণ। ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মত যা কবুলিয়তের অযোগ্য। আখেরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। তবে আল্লাহ্ যেহেতু বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফেরদের নিষ্প্রাণ ভাল আমলগুলোকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না'; বরং দুনিয়ায় এর বিনিময়স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও অর্থ-সম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় : গোনাহ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। উনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "আল্লাহ্ যালেম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না" থেকে কথাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়ঃ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا "তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে তিনি ভাল-মন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" অর্থাৎ, এবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভাল-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে না।

তৃতীয় : নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ, সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হল, আমলের আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর

তা নির্ভরশীল। সূরা মুলকের শুরুতে আছে : لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

চতুর্থ : আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্যে দু'টি বিষয় আবশ্যক। প্রথম, নেয়ামতের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয়, নেয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহ্র মকবুল বন্দাদের জন্যে আয়াতে এ দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (স্থায়ী শান্তি) এতে আছে প্রথম বিষয়, আর خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (তথায় চিরদিন বসবাস করবে) বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চম : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহল, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কোরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রসূলের সম্পর্কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রাঃ), রোমের হযরত সোহাইব (রাঃ),পারস্যের হযরত সালমান (রাঃ), মক্কার কোরাইশ ও মদীনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার এই প্রমাণ বহন করে।

সূরা তওবার ২৪তম আয়াতটি নাযিল হয় মূলতঃ ওদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ-সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদিগকে বলে দিন : "যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ্ নাফরমানদিগকে কৃতকার্য করেন না।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তফসীরশাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। বাক্যের মর্ম হল, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর এ সকল নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন দুনিয়াবী সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এখানে বিধান অর্থ আল্লাহ্র আযাবের বিধান। অর্থাৎ, আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্র আযাব অতি শীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথায় আখেরাতের আযাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারী উচ্চারণটি মূলতঃ হিজরত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদস্থলে উল্লেখ করা হয় জেহাদের—যা হল হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হল। এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জেহাদের আদেশ, যে আদেশ পালনে আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যে সকল বস্তুর মায়া এমন কি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

এও হতে পারে যে, এখানে 'জেহাদ' বলে হিজরতকে উদ্দেশ করা হয়েছে। কারণ, হিজরত মূলতঃ জেহাদেরই অন্যতম অংশ।

আয়াতের শেষ বাক্য হল : وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ "আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করবেন না।" "এতে বলা হয় যে, যারা হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং অর্থ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোন কাজ দেবে না এবং তারা আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জেহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্যে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, আল্লাহ্র রীতি হল, তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

হিজরতের মাসায়েল : প্রথম, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফরয হুকুম যখন আসে, তখন এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমান হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেতো না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মূল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহ্র আদেশ তথা নামায-রোযা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে ফরয।

দ্বিতীয় : গোনাহ্ ও পাপাচার যে দেশে প্রবল, সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে মুস্তাহাব। – (বিস্তারিত অবগতির জন্যে 'ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য)

উল্লেখিত আয়াতে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে পার্থিব সম্পর্কের মোহে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলমানের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার ভালবাসা এ স্তরে নয়, সে আযাবের যোগ্য।

পূর্ণতর ঈমানের পরিচয় : এজন্যে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।" আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : 'রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্যে, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্যে, অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহ্র জন্যে, অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহ্র জন্যে, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।'

হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভালবাসাকে অপরাপর ভালবাসার উর্ধ্বে স্থান দেয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ্-রসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের পূর্বশর্ত।

ইমামে তফসীর কাযী বায়যাবী (রহঃ) বলেন, অল্পসংখ্যক লোকই

আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কারণ, অনেক বড় বড় জালেম ও পরহেযগার লোককেও স্ত্রী-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদের মোহে গ্রস্ত দেখা যায়, তবে আল্লাহ্ যাদের হেফাযত করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কাযী বায়যাবী প্রসঙ্গতঃ একথাও বলেছেন যে, এখানে ভালবাসা অর্থ অনিচ্ছাকৃত ভালবাসা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। তাই কারো অন্তরে যদি পার্থিব সম্পর্কের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এ আকর্ষণ আল্লাহ্-রসূলের ভালবাসাকে প্রভাবিত এবং বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত না করে, তবে তার এ পার্থিব আকর্ষণ উপরোক্ত দণ্ডবিধির আওতায় আসে না। যেমন, কোন অসুস্থ লোক ঔষধের তিক্ততা বা অস্ত্রোপচারকে ভয় করে, কিন্তু তার বিবেক একে শাস্তি এ আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে। এখানে যেমন তার অপারেশন-ভীতি স্বাভাবিক এবং এর জন্যে কেউ তাকে তিরস্কারও করে না, তেমনি স্ত্রী-পরিজন ও অর্থ-সম্পদের মোহে কারো অন্তর যদি শরীয়তের কোন কোন হুকুম পালনে অনিচ্ছাকৃতভাবে চাপ বোধ করে এবং এসত্ত্বেও সে শরীয়তের হুকুম পালন করে, তবে তার পক্ষে দুনিয়ার এ আকর্ষণ দূষণীয় নয়; বরং সে প্রশংসার পাত্র এবং তার আল্লাহ্-রসূলের এ ভালবাসাকে এ আয়াত অনুসারে সবার উর্ধ্বে স্থান দাতাগণের কাতারে শামিল রাখা হবে।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে-মাযহারীতে বলেন, আল্লাহ্ ও রসূলের ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়া এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু এ নেয়ামত লাভ করা যায় আল্লাহ্র ওলীগণের সংসর্গে থেকে। এজন্যে সুফিয়ায়ে কেরাম তা' হাসিলের জন্যে মাশায়েখগণের পদসেবাকে আবশ্যকীয় মনে করেন।' তফসীরে 'রুহুল-বয়ান' প্রণেতা বলেন, 'বন্ধুত্বের এই মাকাম হাসিল হয় তাদের, যারা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর মত নিজের জান-মাল ও সন্তানের কোরবানী দিয়েছে আল্লাহ্র পথে, তাঁরই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।'

কাযী বায়যাবী (রহঃ) স্বীয় তফসীরে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত ও শরীয়তের হেফাযত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

২৫ তম আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানেরা লাভ করে। বলা হয়ঃ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ 'আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে'। এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হোনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে যুদ্ধে এমনসব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্যে আয়াতের শাব্দিক তফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেয়া সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তফসীর অনুধাবন সহজ হবে এবং যে সকল হিতকর বিষয়ের উদ্দেশে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়, তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তফসীরে-মাযহারী থেকে নেয়া হয়েছে, যাতে হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হোনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কোরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজেন গোত্রে —যার একটি শাখা তায়েফের বনূ-সকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশংকা প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশে হাওয়াজেন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত শাখা-গোত্রগুলোকে একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়।

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক বিন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা—বনুকাব ও বনু-কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মদের (সাঃ) বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

যাহোক, এই দুই গোত্র ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক বিন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্যে এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল-হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা শরীফেই অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব ইবনে আসাদ (রাঃ)-কে আমীর নিয়োগ করেন এবং মাআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে লোকদের ইসলামী তলীম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কোরাইশদের থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। কোরাইশ সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? হযরত (সাঃ) বলেন, না, না, বরং ধারস্বরূপ নিচ্ছি। যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেব। একথা শোনে সে একশত লৌহবর্ম এবং নওফেল ইবনে হারেস তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম যুহরীর (রহঃ) বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত (সাঃ) এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যাঁরা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিলেন। বাকী দু'হাজার ছিলেন আশ পাশের অধিবাসী, যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হত 'তোলাকা'। অর্থাৎ, সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত। ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। হযরত (সাঃ) বলেন, ইনশাআল্লাহ্, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনীকেনানা'র সে স্থানে, যেখানে মক্কার কোরাইশগণ ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জেহাদ-উদ্দেশে বের হয়ে পড়ে,

তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্যে বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাবসম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা ইবনে ওসমানও ছিলেন। যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রাঃ)-এর হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা' বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিৎবেগে হযরতের (সাঃ) কাছে পৌছি। কিন্তু দেখি যে, ডান দিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস হযরতের (সাঃ) দেহরক্ষীরূপে আছেন। এজন্যে পেছন দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌছি এবং সংকল্প নেই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁকে হত্যা করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এস। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর রাখেন আর দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্'। এর থেকে শয়তানকে দুর করে দাও।' অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হযরত (সাঃ)-কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরতের (সাঃ) জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হযরত (সাঃ) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খেদমতে হাযির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে। আর আমাকে হত্যার জন্যে আশে পাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ করানো। পরিশেষে তাই হ'ল।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নযর ইবনে হারেসের সাথে, তিনিও এ উদ্দেশে হোনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে হযরতের (সাঃ) ভালবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের মোকাবেলা করেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবু বুরদা ইবনে নায়ার (রাঃ)-এর সাথে। তিনি 'আওতাস' নামক স্থানে পৌছে দেখেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত (সাঃ) বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ্ আমার হেফাযতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। আবু বুরদা (রাঃ) বলেন, ইয়া-রসূলাল্লাহ্! অনুমতি দিন, আল্লাহ্র এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রুদলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। হযরত (সাঃ) বলেন, তুমি থাম, আল্লাহ্র দ্বীন অপরাপর দ্বীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ্ আমার হেফাযত করে যাবেন। এ বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যাহোক, মুসলিম সেনাদল হোনাইন নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল ইবনে হান্‌যালা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্কে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রুদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিতহাস্যে হযরত (সাঃ) বললেন, চিন্তা করো না। ওদের সবকিছু গনীমতের মালামাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাদ্দাদ (রাঃ)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্যে গোয়েন্দারূপে পাঠান। তিনি দু' দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, 'মুহাম্মদ এখনো কোন সাহসী যোদ্ধাবাজদের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কোরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মোকাবেলা। আমরা তাঁর সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে'। বস্তুতঃ এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হল শত্রুদের রণ প্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতিপূর্বের ওহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিনশ' তের জন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফের সৈন্য। তাই হোনাইনের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে হাদীসতত্ত্ববিদ 'হাকেম' ও 'বাজ্জার'-এর বর্ণনামতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবী করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পলাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহ্র উপর ভরসা না করে জনবলের উপর তৃপ্ত থাকবে এটা আল্লাহ্র পছন্দ ছিল না। এটাই হুনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাওয়াযেন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে, এতে সাহাবীগণের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। ফলে তাঁরা পিছু হটতে শুরু করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্পসংখ্যক সাহাবী, যাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শ'। অন্য রেওয়ায়েত মতে এক শ' কিংবা তারও কম, যাঁরা হযরত (সাঃ)-এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদেরও মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জেহাদের বায়আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাক্বারাওয়ালারা কোথায়? জান কোরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সবাই ফিরে এস, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে আছেন।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَ
إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ
يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

(২৭) এরপর আল্লাহ্ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৮) 'হে ঈমানদারগণ মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে আল্লাহ্ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২৯) 'তোমরা যুদ্ধ কর আহ্লে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। (৩০) ইহুদীরা বলে 'ওযাইর আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহ্র পুত্র।' এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্ উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।' (৩১) তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।

হযরত আব্বাসের (রাঃ) এ আওয়ায রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ্ এঁদের সাহায্যে ফেরেশতাদল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফের সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মগোপ করে। এরপর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাফের নেতা নিহত হয়। কতিপয় মুসলমানদের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চব্বিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য।

আলোচ্য ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে যুদ্ধের এদিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দিলেন। 'অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর'। এ বাক্যের অর্থ হল হোনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন; আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণের অর্থ হল, তাঁরা বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্যে অন্য প্রকার হযরতের (সাঃ) সাথে যাঁরা সুদৃঢ় ছিলেন তাঁদের জন্যে। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্যে 'উপর' শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'অতঃপর আল্লাহ্ সান্ত্বনা নাযিল করলেন তাঁর রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর'।

অতঃপর বলা হয়ঃ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখনি। এটি হল সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণিত আছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হলঃ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ''আর শাস্তি দিলেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের পরিণাম।'' এ শাস্তি বলতে বোঝায় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া, যা স্পষ্ট প্রতিভাত হল। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হল। পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

''অতঃপর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আল্লাহ্ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।'' এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছুসংখ্যক লোককে আল্লাহ্ ঈমানের তওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেয়া

হল।

হোনাইন যুদ্ধে হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার নিহত হয়; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরূপে এবং মালামাল গনীমতরূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে।

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে। রসূলে করীম (সাঃ) পনের-বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্যে হেদায়েতের দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি'রানা নামক স্থানে পৌছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশে দর্শকরূপে যুদ্ধে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য ঃ উল্লেখিত আয়াতগুলোর প্রথম হেদায়েত হল, মুসলমানদের কোন অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, তেমন সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে।

হোনাইন যুদ্ধের পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, আল্লাহ্র নিকট তাঁর প্রিয় বন্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফেরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র গায়বী সাহায্য পেয়ে তাঁরা এ যুদ্ধে জয়ী হন।

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণে ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেয়া ঃ দ্বিতীয় হেদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তাহল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে মক্কার বিজিত কাফেরদের থেকে যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ ছিল এবং প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ, এরা ছিল বিজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেত। কিন্তু হযরত (সাঃ) তা করেননি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের হেদায়েত।

তৃতীয় ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের সেখানে, যেখানে মক্কার কোরাইশগণ মুসলমানদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হেদায়েত আছে, তাহল,আল্লাহ্ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। দুর্গে আশ্রয় নেয়া হাওয়াযেন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদ-দোয়ার পরিবর্তে হেদায়েত লাভের যে দোয়া হযরত (সাঃ) করেছেন—তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুকে নিছক পরাভূত করা নয়; বরং উদ্দেশ হল হেদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থ ঃ পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়; আল্লাহ্ ইসলাম ও ঈমানের হেদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযেন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়াযেন গোত্রের যুদ্ধবন্দী মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা আনন্দের সাথে রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। লজ্জা বা জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা' সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ এ থেকে মাসআলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনে চাঁদা আদায় করাও জায়েয নয়। কারণ, অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে, অথচ অন্তর এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থ-কড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না।

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.... – সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল-হারাম' বলতে সাধারণতঃ বোঝায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কোরআন ও হাদীসে কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হরম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয় যা কয়েক বর্গমাইল এলাকাব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। যেমন, মে'রাজের ঘটনায় মসজিদুল-হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামগণের ঐকমত্যে এখানে মসজিদুল-হারাম অর্থ বায়তুল্লাহ্র আঙ্গিনা নয়। কারণ, মে'রাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহ্র আঙ্গিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম - এর উল্লেখ রয়েছে الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তার অর্থও পূর্ণ হরম শরীফ। কারণ, এখানে উল্লেখিত সন্ধির স্থান হল 'হোদায়বিয়া' যা হরম শরীফের সীমানার বাইরে তার সন্নিকটে অবস্থিত।— (জাস্সাস)। এ বছরের পর মুশরিকদের জন্যে পূর্ণ হারাম-শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল।

তবে এ বছর বলতে কোন্টি বোঝায় তা নিয়ে মুফাসেরিগণের কিছু মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরী। তবে অধিকাংশ মুফাসসেরের মতে তাহল নবম হিজরী। কারণ, নবী করীম (সাঃ) নবম হিজরীর হজ্বের মৌসুমে হযরত আলী ও আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরী থেকে দশম হিজরী পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরীর পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

কতিপয় প্রশ্ন ঃ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরীর পর মসজিদুল-হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিনটি প্রশ্ন আসে। প্রথম, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল-হারামের জন্যে, না অন্যান্য মসজিদের জন্যেও? দ্বিতীয়, মসজিদুল-হারামের জন্যে হয়ে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্যে, না শুধু হজ্ব ও ওমরার জন্যে? তৃতীয়, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্যে, না আহলে-কিতাব কাফেরদের জন্যেও?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কোরআন নীরব। তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও হযরত (সাঃ)-এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতে হয়, কোরআন মজিদ মুশরিকদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন্ দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রহেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ, দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি কুফর-শেরকের গোপন অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবতঃ এর হুকুম হবে ভিন্ন।

'তফসীরে-কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ মদীনার ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ তথা ইমাম মালেক (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণের মতে মুশরিকরা যে কোন দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ, তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি ফরয গোসলেরও ধার ধারে না। তদুপরি কুফর শিরকের বাতেনী অপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্যেই হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের (রহঃ) একটি ফরমানকে দলীলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকগণকে লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, "মসজিদসমূহে কাফেরদের প্রবেশ করতে দেবে না।" এ ফরমানে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলীল হল নবী করীম (সাঃ)-এর এই হাদীস ঃ 'কোন ঋতুবতী মহিলা বা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েয মনে করি না।" আর এ কথা সত্য যে, কাফের-মুশরিকগণ ফরয গোসল সাধারণতঃ করে না। তাই তাদের জন্যে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, হুকুমটি কাফের মুশরিক এবং আহলে-কিতাব সকলের জন্যে প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল - হারামের জন্যে নির্দিষ্ট; অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।— (কুরতুবী) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দলীল হল ছুমামা ইবনে উছালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে একস্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম (সাঃ) তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে উপরোক্ত আয়াতে মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে মুশরিকদের প্রতি যে আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হল, আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি অনুযায়ী হজ্ব ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেয়া যাবে না। তাঁর দলীল হল, হজ্বের যে মৌসুমে হযরত আলী (রাঃ)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়, তাতে একথা ছিল- لايحجن بعد العام مشرك অর্থাৎ, 'এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না।' তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াত ... فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ,'মুশরিকগণ মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী হবে না'—এর অর্থ হবে আগামী বছর থেকে মুশরেকদের জন্যে হজ্ব ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অতঃপর বলেন, হজ্ব ও ওমরা ছাড়া মুশরিকগণ অন্য কোন প্রয়োজনে আমীরুল-মু'মিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল - হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাঁর দলীল হলো, মক্কা বিজয়ের পর সকীফ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে মসজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ, এরা তখনও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামও আপত্তি তুলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এরা তো অপবিত্র। হযরত (সাঃ) তখন বলেছিলেন, 'মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না।'- (জাসসাস)

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন-মজীদে মুশরিকদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে, তা তাদের কুফর ও শিরকজনিত বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন মুশরিক মসজিদের নিকটবর্তী হবে না। তবে সে কোন মুসলমানের দাস বা দাসী হলে প্রয়োজন-বোধে প্রবেশ করতে পারে।—(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল-হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না, বরং আসল কারণ হল কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির আশংকা। এ আশংকা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেয়া হল। এছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফের-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানগণও মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে এখানে মসজিদুল-হারাম বলতে যখন পূর্ণ হরম শরীফ উদ্দেশ, তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে না হয়ে কুফর-শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্যে শুধু মসজিদুল-হারামের নয়, বরং পূর্ণ হরম শরীফে মুশরেকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এটি হল ইসলামের দুর্গ।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর উপরোক্ত তত্ত্বের সার কথা হল, কোরআন ও হাদীসমতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং এটি জরুরী বিষয়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদী হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বরাআতের শুরুতে। অর্থাৎ, অচিরেই হরম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হরম শরীফ ত্যাগের আদেশ দেয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তের চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার এবং অন্যান্যদের কিছু দিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এই আদেশ কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, 'এবছরের পর-পূর্ণ হরম-শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না'। তারা শেরেকী প্রথা মতে হজ্ব ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তওবার আয়াতে যেমন পরিষ্কার ঘোষণা দেয়া হয় যে, নবম হিজরীর পর কোন মুশরিক হরমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলে করীম (সাঃ) এ আদেশকে আরও ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোন কাফের-মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু হযরত (সাঃ) নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ

করেন।

ইতিপূর্বে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতদ্বয়ে আহ্‌লে-কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহ্‌লে কিতাবের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ-অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দু'টি তারই পটভূমি। 'তফসীরে-দুররে মনসুরে' মুফাসসেরে-কোরআন হযরত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াত দু'টি তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল।

আভিধানিক অর্থে 'আহলে-কিতাব' বলতে যদিও সেই কাফের দলসমূহকে বোঝায়, যারা কোন না কোন আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী; কিন্তু কোরআনের পরিভাষায় আহ্‌লে-কিতাব বলতে বোঝায় শুধু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের। কারণ, আরবের আশেপাশে এই দু-সম্প্রদায়ই আহ্‌লে-কিতাব নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এজন্যে কোরআনে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হয়ঃ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ অর্থাৎ, তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম—(আনআম ঃ- ১৫৬)।

আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করে অত্র আয়াতদ্বয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যেই। কারণ, যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা' সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ-উদ্দেশে যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা অন্ততঃ তাওরাত-ইঞ্জীল এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব, পূর্বের আম্বিয়া (আঃ) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জেহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে আহ্‌লে-কিতাবের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এই দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ, এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে তওরাত ইঞ্জীলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জীলের রয়েছে রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।

প্রথম আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে। প্রথমতঃ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে না। দ্বিতীয়তঃ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ রোজ হাশরের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। তৃতীয়তঃ

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না। চতুর্থতঃ

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক।

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা তো বাহ্যতঃ আল্লাহ্, পরকাল ও রোজ কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান বিশ্বাস আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোন মূল্য নেই। ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইহুদীদের কর্তৃক হযরত ওযাইর ও খ্রীষ্টানদের কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করা প্রকারান্তরে শিরক তথা অংশীবাদকে স্বীকার করে নেয়া। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবী অর্থহীন।

অনুরূপ, আখেরাতের প্রতি যে ঈমান-বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা আহ্‌লে-কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, রোজ কেয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হল জান্নাত আর অশান্তি হল জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কোরআনের পেশকৃত ধ্যান-ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হল-তওরাত ও ইঞ্জীলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য-যা তওরাত ও ইঞ্জীলে হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।

এ থেকে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা' নয়, বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। তবে হারামকে হারাম মনে করে কেউ যদি ভুলে অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরী নয়, বরং তা গোনাহ্ ও ফাসেকী।

আয়াতে উল্লেখিত حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ "যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে" বাক্য দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

'জিযিয়া'র শাব্দিক অর্থ, বিনিময়' পুরস্কার। শরীয়তের পরিভাষায় জিযিয়া বলা হয় কাফেরদের প্রাণের বিনিময়ে গৃহীত অর্থকে।

জিযিয়ার তাৎপর্য ঃ কুফর ও শিরক হল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ্ নিজের অসীম রহ্‌মতগুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযিয়াকর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান থাকবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরীয়তের পরিভাষায় এ হল জিযিয়া কর।

দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে জিযিয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরীয়তের পক্ষ থেক কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিযিয়া নেয়া হবে। যেমন, নাজরান গোত্রের সাথে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) –এর চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ, এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ।

অনুরূপ তাগ্‌লিব গোত্রীয় খ্রীষ্টানদের সাথে হযরত ওমর (রাঃ)-এর চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিযিয়াকর প্রদান করবে।

মুসলমানগণ যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসিগণকে তাদের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার তা হবে যা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলের। তাহল, উচ্চবিত্তের জন্যে মাসিক চার দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্যে দু'দিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্নবিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। অর্থাৎ, সাড়ে তিন মাশা রূপা অথবা তার সমমূল্যের অর্থ। গরীব-দুঃখী, বিকলাঙ্গ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মযাজকদের এই জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিযিয়া আদায়ের বেলায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি করা না হয়। হযরত (সাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, "যে ব্যাক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর যুলুম চালাবে, রোজ হাশরে আমি যালেমের বিরূদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।" - (মাযহারী)

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহের প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এক মত পোষণ করেন যে, শরীয়ত জিযিয়ার বিশেষ কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন।

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হল যে, জিযিয়া প্রথা 'ইসলামের বিনিময় নয়' বরং তা আদায় করা হয় কাফেরদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের বিনিময়ে। সুতরাং এ সন্দেহ যেন না হয় যে, অল্প মূল্যের বিনিময়ে ওদের কুফরী অবস্থায় বহাল থাকার অনুমতি কেমন করে দেয়া হল? কারণ, এমন অনেক লোক অছে, যাদের স্বধর্মে অবিচল থেকে বিনা জিযিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। যেমন, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ এবং যাজক সম্প্রদায়। ইসলামের বিনিময়ে জিযিয়া নেয়া হলে এরা কিছুতেই অব্যাহতি পেত না।

আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَّدٍ শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ অর্থ এখানে কারণ, يد অর্থ শক্তি ও বিজয়। তাই জিযিয়া যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মত না হয়; বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসেবে। — রূহুল মা'আনী)। এরপরের বাক্য হল— وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল— তারা যেন ইসলামের সাধারণ আইন-কানুনের আনুগত্যকে নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয়।— (রূহুল-মা'আনী, তফসীরে মাযহারী)।

জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য। তারা আহলে-কিতাব হোক বা অন্য কেউ। তবে আরবের মুশরিকগণ এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের থেকে জিযিয়া গৃহীত হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত হল প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা। প্রথম আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, আহলে-কিতাবগণ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে না। দ্বিতীয় আয়াতে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা হযরত ওযাইর (আঃ) ও খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র সাব্যস্ত করে। তাই তাদের ঈমান ও তওহীদের দাবী নিরর্থক। এরপর বলা হয়— ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ 'এটি তাদের মুখের কথা।' এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদার কথা নিজ মুখেও স্বীকার করে। এতে গোপনীয়তা কিছুই নেই। (দুই) তারা মুখে যে কুফরী উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি। অতঃপর বলা হয় ঃ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ "এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে, আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন। ওরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে"। এতে অর্থ হল ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা নবীগণকে আল্লাহ্র পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফের ও মুশরিকদের মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত-মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করেছিল।

উপরোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ে ইহুদী-খ্রীষ্টান পন্ডিত ও পীর-পুরোহিতগণের কুফরী উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। احبار - حبر - এর এবং رهبان - راهب - এর বহুবচন। حبر ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আলেমকে এবং راهب তাদের সংসারবিরাগীদেরকে বলা হয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানরা তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহ্র পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ হযরত ঈসা (আঃ)-কেও মাবুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহ্র পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলেম ও যাজক শ্রেণীকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হল, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহ্র রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্যে উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ, তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; তা আল্লাহ্-রসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? বলাবাহুল্য, পুরোহিতগণের আল্লাহ্-রসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আর এটি হল প্রকাশ্য কুফরী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শরীয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে-কেরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের অনুসরণ-এর সাথে অত্র আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, এঁদের অনুসরণ হল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্-রসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হল, ইমাম ও আলেমগণ আল্লাহ্-রসূলের আদেশ-নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলেমদের জিজ্ঞেস করে— তারপর সেমতে আমল করেন। যে ওলামায়ে-কেরামের ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের পায়রবী করেন। এই পায়রবী হল কোরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলতঃ আল্লাহ্রই পায়রবী। কোরআনে এরশাদ হয় ঃ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হও, তবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদী-খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্র কিতাব এবং আল্লাহ্র রসূলের আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় অত্র আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, "এই গোমরাহী অবলম্বন করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ হল একমাত্র তাঁর এবাদত করার এবং তিনি তাদের শেরেকী কার্য কলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।"

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى
ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ
ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ
عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ
وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا
فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ
هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾
إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى
كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟
فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا
يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

(৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন —যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৩) তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৪) হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (৩৫) সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে) ,এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার। (৩৬) নিশ্চয় আল্লাহ্র বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ্ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদী–খ্রীষ্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহ্র অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহ্র সত্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্যে অসম্ভব। বরং আল্লাহ্র অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর ৩৩ নং আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ্ আপন রসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কোরআন এবং সত্য দ্বীন–ইসলাম সহকারে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কোরআনে রয়েছে, যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দ্বীনের উপর দ্বীনে–ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিক্‌দাদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ্ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহ্র এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদী–খ্রীষ্টান পীর–পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী–খ্রীষ্টানের আলোচনায় মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইহুদী খ্রীষ্টান পীর–পুরোহিতগণের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলাধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহ্র সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখছে।

অধিকাংশ পীর–পুরোহিতগণের যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সাধারণতঃ সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ তা না করে كثيرا (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনরূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হল, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি–নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা–বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হল যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না।

ছাড়া, পীর-পুরোহিতগণের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ তাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়।

ইহুদী-খ্রীষ্টান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় তের লোভ-লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে বর্ণিত অর্থলিপ্সার করুণ তি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় ত হয়। এরশাদ হয়েছে ঃ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর াবের সুসংবাদ দিন।"

"আর তা খরচ করে না আল্লাহ্র পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যে, যারা বিধানমতে আল্লাহ্র ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে দের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রসূলে করীম াঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা া সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়।" -(আবু দাউদ, আহমদ)। এ থেকে া যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা াহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ঈমামগণ এমতের অনুসারী।

وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا "আর তা খরচ করে না" বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হল রৌপ্য। অথচ, আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে মাযহারীর মতে এ বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে যাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাবমতে যাকাত প্রদান করবে।

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ, যে অর্থ সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের রূপধারণ করে।

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট মাস-গণনায় মাস হল বারটি।" এখানে উল্লেখিত عدت অর্থ গণনা। شهور হল شهر -এর বহুবচন। অর্থাৎ, মাস। বাক্যের সারমর্ম হল, আল্লাহ্র কাছে মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত; এতে কম বেশী করার কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আযল অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে-মাহফুযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হয়। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে।

তারপর বলা হয়- مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ, তন্মধ্যে চার মাস হল নিষিদ্ধ। সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হল, এই চারটি মাস সম্মানী, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে এবাদতের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা ইসলামী শরীয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং এবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকী রয়েছে।

বিদায় হজ্বের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোতবায় নবী করীম (সাঃ) সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, 'তিনটি মাস হল ধারাবাহিক— যিলকদ, যিলহজ্ব ও মহররম, অপরটি হল রজব। তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব হল রমযান। আর মুযার গোত্রের ধারণামতে রজব হল জমাদিউস-সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম (সাঃ) খোতবায় মুযার গোত্রের রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ "এটিই হল সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ, মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহ্কামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হল দ্বীনে-মুসতাকীম। এতে কোন মানুষের কম-বেশী কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না" অর্থাৎ, এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং এবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) 'আহ্কামুল - কোরআন' গ্রন্থে বলেন, কোরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে এবাদত করা হলে বাকী মাসগুলোতেও এবাদতের তওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকী মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ
إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾
انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

(৩৭) এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহ্‌র হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (৩৯) যদি বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৪০) যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ্ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহ্‌র কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আহকাম ও মাসায়েল

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত, তা মানবরচিত পরিভাষা নয়; বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তরতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহ্‌কাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শরীয়তের আহ্‌কামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্রমাসের হিসাবমতেই রোযা, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কোরআন মজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদন্ডরূপে অভিহিত করেছেন— لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর)। অতএব, চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহ্‌র অধিকতর পছন্দ। তাই শরীয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্যে চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কেফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গোনাহ্‌গার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে তা আল্লাহ্‌র রাসূল ও পরবর্তীগণের তরীকার বরখেলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও না-জায়েয মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা, এতে শরীয়তের বিধানের কোন সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরীয়তের হুকুম পরিবর্তিত হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল ঃ অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা' এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে – حب الدنيا رأس كل خطيئة অর্থাৎ, দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয় ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার উল্লেখ করা হয়েছে যে, "পার্থিব জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।"

সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামী আকাদীর মৌলিক বিষয় তিনটি ঃ তওহীদ, রেসালত ও পরকালের বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হল বিশুদ্ধ আমলের রূহ

এবং গোনাহ্ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃংখলা আখেরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন-আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুতঃ এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, পার্থিব ব্যস্ততা এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হল, আল্লাহ্র যিকর ও স্মরণ এবং আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাগণেরও ঈর্ষার পাত্র হয়েছিল। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ-যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ্ ও আখেরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ্র ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা' বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরোক্ত কোরআনী প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

৩৯ নং আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, ''তোমরা জেহাদে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৪০ নং আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ্র রসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মোহতাজ নন। আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে গায়ব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিগুহা, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল তাঁর শত্রুরা। তখন গুহা-সঙ্গী আবু বকর (রাঃ)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু এ সময়েও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফরসঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।'' দু'শব্দের এ বাক্যটি বলা মুশকিল কিছু নয়। কিন্তু শ্রোতাবৃন্দ এ নাজুক দৃশ্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝতে দেরী হবে না যে, নিছক দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের প্রতি ভরসা রেখে মনের এই নিশ্চিন্তভাব সম্ভব নয়। তবুও যে সম্ভব হল, আয়াতের পরবর্তী বাক্যে তার রহস্য বলে দেয়া হল। এরশাদ হয়ঃ 'আল্লাহ্ তাঁর কলব মোবারকে সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য করেন, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।'' অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতাগণও হতে পারেন এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ, এগুলোও আল্লাহ্র সৈন্যদল। সার কথা, এর ফলে কুফরীর পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহ্র ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

৪১ নং আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জেহাদে বের হবার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ
وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ
لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ اَنْفُسَهُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ
اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيمٌۢ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ
لَاَعَدُّوا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا
وَّلَاَاوْضَعُوا خِلٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ
وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌۢ بِالظّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

(৪২) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ্ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (৪৪) আল্লাহ্ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ্ সাবধানীদের ভাল জানেন। (৪৫) নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে। (৪৬) আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহ্র পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (৪৭) যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালিমদের ভালভাবেই জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৪২ নং আয়াতে অলসতার দরুন জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ যে শক্তি–সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা, আল্লাহ্র রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

গ্রহণযোগ্য ওযর ও বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওযর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তাহল, সেই লোকদের ওযর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাযুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে, কিন্তু আদেশ পালনে যার কোন কোন ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোন ওযরও উপস্থিত হয়, তবে গোনাহের এ ওযর হবে গোনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুমআ'র নামাযে শরীক হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ্ মা'যুর লোকের পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুমআ'র কোন প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোন ওযর উপস্থিত হলে তা'হবে বাহানার নামান্তর।

উদাহরণতঃ দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাআতে শরীক হওয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময়মত জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামায কাযা হয়ে যায়। যেমন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর লায়লাতুত্ তা'রীসের ঘটনা। সময়মত জেগে উঠার জন্যে তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে নিয়োজিত রাখেন যেন প্রত্যূষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলের চোখ খোলে। এ ওযর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবা কেরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لاتفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة অর্থাৎ, "ঘুমের মধ্যে মানুষ মা'যুর। তাই এটি হল যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।'' সান্ত্বনার কারণ হল, সময়মত জেগে উঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোন ওযর গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমা-খরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

৪২ নং আয়াতে মিথ্যা ওযর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জেহাদ থেকে নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয় وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে আছে এমন এক সরল প্রাণ মুসলমান যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হত।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ
حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي
الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾
إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ
يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ
فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ
مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ
هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ
نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ
أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ
أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا
فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا
أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾

(৪৮) তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহ্‌র হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করল। (৪৯) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (৫০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। (৫৩) 'আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা' কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ, "ইতিপূর্বেও তারা ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল।" যেমন, ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে। وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌র বিজয় হল, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে ওযর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। কোরআন মজীদ তার কথার উত্তরে বলে ঃ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا "ভাল করে শোন" এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ, রসূলের অবাধ্যতা ও জেহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে"। তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখেরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ হতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যতঃ মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ "আপনার কোন মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কাল হয়ে যায়" وان تصبك مصيبة فرحوا এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্যে যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার হেদায়েত দান করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا "আপনি ঐ বস্তু পূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হল এক যবনিকাবিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহ্‌রই। আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই তা' আগেই আল্লাহ্ আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায়-উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভাল-মন্দ নির্ভরশীল নয়।

তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য ঃ বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুলঃ আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم
بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا
لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ
فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا
مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ
رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا
مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

(৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে। (৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারূপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসূলও, আমরা শুধু আল্লাহ্‌কেই কামনা করি। (৬০) "যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে- এই হল আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়, এবং বলে, এ লোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহ্‌মতবিশেষ। আর যারা আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

মূল-তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা) এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বরং তার অর্থ হল, সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের পর সাধ্যমত চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে; আর দৃষ্টি আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ, চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হলেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্ম বিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর দিকে কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা দেয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জেহাদের জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি,তা' দেখিয়ে দিয়েছে। ফার্সী প্রবাদ আছে, তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা
বেঁধে নাও।' অর্থাৎ, দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহ্‌র নেয়ামত, এ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার না করা হল না-শোকরী ও মূর্খতা। তবে উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয়; বরং আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন, সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মু'মিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা আমাদের জন্যে শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মু'মিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙ্গনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি। এই হল هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ 'তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?'

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হল, এগুলোর দ্বারা তাদের আযাবে রাখা) বাক্যে মুনাফিকদের জন্যে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হল, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্যে পার্থিব জীবনেও এক বড় আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্যে নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাযত আর না পরিবার-পরিজনের সাথে আমোদ-আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হল একেকটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ

পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামত কড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর পায় এবং তখন সে চিন্তা-ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থ-সম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাত-ছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না। বস্তুতঃ এটাই হল আযাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা' নিয়েই দিবা-নিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখেরাতের আযাবের পটভূমি।

কাফেরদের সদকা দেয়া যায় কি? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদ্‌কার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমত না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করত। এখানে যদি সদকার সাধারণ অর্থ নেয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদ্‌কা বোঝায়, তবে কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ, অমুসলিমদের নফল সদ্‌কা দান ইমামগণের ঐকমত্যে জায়েয এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদ্‌কা বলতে ফরয সদকা যথা, যাকাত ও ওশর প্রভৃতি বোঝানো হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্যে দেয়া হত যে, তারা নিজেদেরকে মুসলমানরূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরীর কোন প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্ বিশেষ কোন উদ্দেশে আদেশ দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক।—(বয়ানুল কোরআন)

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى "তারা নামাযে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে"— আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাযে আলস্য ও দান-খয়রাতে কুন্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু'প্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

সদ্‌কার ব্যয় খাতঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে সদ্‌কা সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (নাউযু-বিল্লাহ্) সদ্‌কা বন্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সদ্‌কার ব্যয়-খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদ্‌কা পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্র হুকুমমতেই সদ্‌কার বিলি-বন্টন করছেন; নিজের খেয়াল-খুশীমত নয়।

হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ ও দারে কুত্নী গ্রন্থে বর্ণিত এবং হযরত যেয়াদ বিন হারেস ছদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে হযরত (সাঃ) আমাকে বলেন, ياخاصداء، المطاع فى قومه অর্থাৎ, 'তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা।' আমি আরয করলাম, এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহ্র অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে হযরত (সাঃ)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হুযূর (সাঃ) তাকে জবাব দিলেনঃ 'সদ্‌কার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ্ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদ্‌কার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।— (কুরতুবী-পৃষ্ঠা ১৬৮, খণ্ড-১)

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ অর্থাৎ, ধনীদের সম্পদে রয়েছে ফকীর-বঞ্চিতদের অধিকার (সূরা যারিয়াত) এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরীবদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে; আর এ হল তাদের হক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধনীরা যে দান-খয়রাত করে, তা তাদের এহ্সান নয়, বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ হক আল্লাহ্ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল-খুশীমত তাতে কম-বেশী করতে পারবে না। আল্লাহ্ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রসূলের উপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহাবায়ে কেরামকে মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত ওমর ফারূক ও আমর ইবনে হাযম, (রাঃ)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের নেসাব এবং প্রত্যেক নেসাবে যাকাতের যে হার তা চিরদিনের জন্যে আল্লাহ্ তাঁর রসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে বা কোন দেশে কম-বেশী বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ নাযিল হয়। তফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মুযযাম্মিলের আয়াত فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ('সুতরাং নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর'।) — দ্বারা তাই প্রমাণ করা হয়। কারণ, সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিল হয়েছে। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে যাকাতের বিশেষ নেসাব বা বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত, তা' মুসলমানগণ মুক্তহস্তে আল্লাহ্র রাহে দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদীনা শরীফে যাকাতের নেসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সদ্‌কা ও যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সদ্‌কার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্যে নামাযের মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদ্‌কারই খাত। হাদীসমতে নফল সদ্‌কা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে ওয়াজিব ও নফল উভয় সদকাই শামিল রয়েছে, **তবে অত্র আয়াতে ইমামগণের ঐকমত্যে কেবল ফরয সদ্‌কার** খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, কোরআনে যেসব স্থানে 'সদ্‌কা' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল

সদ্‌কার কোন নিদর্শন না থাকলে ফরয সদ্‌কাই উদ্দেশ্য হবে।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সদ্‌কার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা যাবে না। যেমন, জেহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভাল ও আবশ্যকীয় এবং তাতে ব্যয় করা যে বড় সওয়াবের কাজ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সকল সদ্‌কার হার নির্দিষ্ট, তা' এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না।

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ 'সাদাকাত' হল সদ্‌কার বহুবচন। আরবী অভিধানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সম্পদের সে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে সদ্‌কা বলা হয়।—(কামুস) ইমাম রাগেব (রাঃ) 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, দানকে সদ্‌কা বলা হয় এজন্যে যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবী করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোন পার্থিব স্বার্থে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশেই তার এই দান-খয়রাত। বস্তুতঃ যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়াকারী যুক্ত থাকে, কোরআন সে দানকে ব্যর্থ বলে গণ্য করেছে।

সদ্‌কা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্যে শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয সদ্‌কার ক্ষেত্রেও কোরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এবং আলোচ্য إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ আয়াত প্রভৃতি। বরং আল্লামা কুরতুবী (রহঃ)-এর তত্ত্ব মতে কোরআনে যেখানে শুধু সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদ্‌কা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদীসে সদ্‌কা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, 'কোন মুসলমানের সাথে হৃষ্টচিত্তে সাক্ষাৎ করাও সদ্‌কা, কোন বোঝা বহনকারীর কাঁধে ভার তুলে দেয়াও সদ্‌কা। কূপ থেকে নিজের জন্যে উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদ্‌কা।' এ হাদীসে সদ্‌কা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচা আয়াতের তৃতীয় শব্দ হল لِلْفُقَرَاءِ -এর শুরুতে لَ('লাম') বর্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, সকল সদ্‌কা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে।

আটটি খাতের বিবরণ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকীর হল যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে যাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথা, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সে-ও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়ালা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে।

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সে-ই নেসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। অনুরূপ, যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে— সব মিলে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার সমমূল্য হয়, তবে সেও নেসাবের মালিক ; তাকেও যাকাত দেয়া নেয়া জায়েয নয়। তবে এ হিসাবে যে নেসাবের মালিক নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও যার রয়েছে, তাকে যাকাত দেয়া অবশ্য জায়েয, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্যে জায়েয নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম। এব্যাপারে অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা কিছু করে, তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত করেছেন।— (আবু দাউদ (রাঃ) হতে কুরতুবী)

অবশ্য সাধারণ সদ্‌কা অমুসলিমদেরকেও দেয়া যায়। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামেন প্রেরণ কালে যাকাত সম্পর্কে হেদায়েত দিয়েছিলেন যে, যাকাতের অর্থ শুধু মুসলিম ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং মুসলিম গরীবদেরকে দেয়া হবে। তাই যাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌কা-খয়রাত এমনকি সদ্‌কায়ে ফিতরও অমুসলিমদের দেয়া জায়েয।—(হেদায়া)

দ্বিতীয় শর্ত নেসাবের মালিক না হওয়া। আর তা ফকীর বা মিসকীন শব্দের অর্থেই প্রকাশ পায়। কেননা, তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না অথবা নেসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। যাহোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যার প্রথমটি হল "আমেলীনে সদ্‌কা" অর্থাৎ, সদ্‌কা আদায়কারী। এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও ওশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুলমালে জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কোরআন মজীদে উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে।

এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের থেকে যাকাত ও অপরাপর সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে। আর সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "হে রসূল, আপনি তাদের মালামাল থেকে সদ্‌কা আদায় করুন।" উক্ত আয়াত মতে রসূলের অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীরুল মু'মেনীনের উপর যাকাত ও সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে "আমেলীন" বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেস সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে।

এ আয়াত মতে নবী করীম (সাঃ) অনেক সাহাবাকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকে তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ ধনীদের জন্য সদ্‌কার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমতঃ যে জেহাদের উদ্দেশে বের হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়তঃ সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ সেই অর্থশালী ব্যক্তি, যার মজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি ঋণ আদায় করে গরীব-মিসকীন থেকে সদ্‌কার মালামাল ক্রয় করে। প্রকমতঃ যাকে গরীব লোকেরা সদ্‌কার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে।

সদ্কা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে সে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হল, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হবে। —(আহ্কামুল-কোরআন ঃ জাস্সাস, কুরতুবী) তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত যাকাতের অর্ধাংশের বেশী দেয়া যাবে না। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকী থাকে না, তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশী বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না।—(তফসীরে মাযহারী, যহীরিয়া)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যাকাত তহ্বীল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেয়া হয়, তা সদ্কা হিসেবে নয়, বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং যাকাত থেকে তাদেরকে দেয়া জায়েয। আট প্রকারের ব্যয়খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দেয়া যায়। অথচ, যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোন বিনিময় ছাড়াই গরীবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীবকে কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

এখানে দু'টি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ যাকাত আদায়কারীদেরকে কাজের বিনিময়ে কিরূপে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে? দ্বিতীয়তঃ ধনীর জন্যে যাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে? উভয় প্রশ্নের উত্তর একটিই। তা'হল এই যে, সদ্কা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারা আসলে গরীবদেরই উকীলস্বরূপ। বলাবাহুল্য, উকীল কিছু গ্রহণ করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো কাছ থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে, তবে কর্জের টাকা উকীলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন ঋণী ব্যক্তি দায়িত্ব মুক্ত হয়, তেমনি গরীবদের উকীল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদ্কা আদায় করলেও ধনীদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উকীল হিসেবে সদ্কার যে অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরীবরাই তার মালিক হবে। এর পর যাকাতের অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেয়া হয়, তা আসলে গরীবদের পক্ষ থেকেই, ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরীবরা যাকাতের অর্থ যে কোন প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকীলদের পারিশ্রমিক দেয়ার অধিকারও তাদের থাকবে।

অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, যাকাত আদায়কারীদেরকে তো গরীবরা উকীল নিযুক্ত করেনি, তারা কেমন করে উকীল সেজে বসল? জবাব হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে দেশের সকল গরীব-মিসকীনের উকীল। কারণ, এদের ভরণ-পোষণের সমুদয় দায়িত্ব তাঁর। তিনি যাকাত আদায়ের জন্যে যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গরীবদেরও উকীল সাব্যস্ত হয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সদ্কা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা দেয়া হয় তা' মূলতঃ যাকাতের টাকা নয়; বরং যাকাত যে গরীবদের হক, সে গরীবদের পক্ষ থেকেই তা' কাজের বিনিময় মাত্র।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামী মাদ্রাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিগণ সদ্কা ও যাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই যাকাত-সদ্কা থেকে তাদের বেতন-ভাতা আদায় করা যাবে না; বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, তারা ধনীদের উকীল, গরীবদের নয়। ধনীদের পক্ষ থেকেই যাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেয়া হয়। সুতরাং যাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের যাকাতও আদায় হবে না।

তারা যে গরীবদের উকীল নয়, তা সুস্পষ্ট। কারণ, কোন গরীব তাদের উকীল নিযুক্ত করেননি এবং আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা করেন না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকীল হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং যাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এ ব্যাপারে সাধারণতঃ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠান যাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিন্ধুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর যাকাতদাতারা মনে করে যে, যাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের যাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা যাকাতের নির্ধারিত যে কোন একটি খাতে ব্যয়িত হবে।

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের যাকাত আদায়কারীদেরকে আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে যাকাতের অর্থ থেকে তাদের বেতন পরিশোধ করে। একান্তভাবেই এটি অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা কারো পক্ষেই তা জায়েয নয়।

এবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ ঃ এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে। কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন এবাদতের বিনিময় ও মজুরী নেয়া হারাম। মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به অর্থাৎ, "কোরআন পাঠ কর, কিন্তু কোরআনকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে পরিণত করো না।" অপর হাদীসে কোরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ একমত যে, এবাদত-বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে সদ্কা-খয়রাত আদায় করাও এবাদত ও দ্বীনের একটি সেবা। রসূলে করীম (সাঃ) একে এক প্রকারের জেহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাই এ এবাদতের মজুরী গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। অথচ কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েয করে দিয়েছে এবং যাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে।

ইমাম কুরতুবী (রাঃ) তাঁর তফসীরে বলেন, যে এবাদত ফরযে আইন বা ওয়াজেবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে এবাদত ফরযে কেফায়াহ, তার বিনিময় নেয়া এ আয়াত মতে জায়েয। ফরযে কেফায়াহ্ হল, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্যে ফরয, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরী নয়, কিছু লোক আদায় করলেই সবাই দায়িত্ব মুক্তি হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হয়।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, "এ আয়াত মতে ইমামতি ও ওয়ায-নসীহতের পারিশ্রমিক নেয়াও জায়েয রয়েছে। কারণ, এগুলো ওয়াজেবে-আইন নয়; বরং ওয়াজেবে-কেফায়াহ্।" অনুরূপ কোরআন-হাদীস ও অপরাপর দ্বীনী এলমের তালীম ও প্রচার সকল উম্মতের জন্যেই ফরযে-কেফায়াহ। কতিপয় লোক দায়িত্ব পালন করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাই এ সকল এবাদতের বিনিময় নেয়া জায়েয।

যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত হল 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'। সাধারণতঃ তারা

তিন-চার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ ছিল ধনী, কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ক মুসলমান, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্যে তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না; বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহ্র বন্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুন কুলুবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদ্কার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্কার অংশ দেয়া হত। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীই এতে রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবী-যুগে উল্লেখিত বিশেষ কারণে এদের সদ্কা দান করা হত। কিন্তু হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের পর যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফেরদের শত্রুতা থেকে বাঁচা ও নওমুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্য আর বাকী থাকেনি। তাই তাদের সদ্কা দানও বন্ধ করে দেয়া হয়। কতিপয় ফেকাহবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ)।

তবে অপরাপর ইমাম ও ফেকাহবিদগণের মতে হুকুমটি রহিত নয়; বরং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যুগে প্রয়োজন ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণীর লোকদিগকে যাকাতের অংশ দেয়া যাবে। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব ইবনে আরবী, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)।

প্রকৃত সত্য কথা হল এই যে, কোন যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদের অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত— 'মুআল্লাফাতুলকুলুবে' শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে রসূলে করীম (সাঃ) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্কার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন, وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر অর্থাৎ, তারা ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

অনুরূপ তফসীরে মাযহারীতে আছেঃ

لم يثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم اعطى احدا من الكفار للايلاف شيئامن الزكوٰة অর্থাৎ, কোন রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন। এ কথার সমর্থনে তফসীরে কাশ্শাফের একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, "কোরআনে এ স্থানে যাকাতের ব্যয়খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হল কাফের-মুনাফেকদের অপবাদ খন্ডন করা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আয়াতে এই ব্যয়-খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সদকায় কাফেরদের কোন অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলুবে কাফেরগণ শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।"

তফসীরে মাযহারীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে; যা কোন কোন হাদীসের রেওয়ায়েতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোন কোন অমুসলিমদেরকেও কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন। সুতরাং সহীহ্ মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে সে কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ্কে তার কাফের থাকাকালে কিছু উপঢৌকন দান করেছেন, সে সম্পর্কে ইমাম নবভী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্য থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুলমালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফেকাহবিদগণের ঐকমত্যেই জায়েয। অতঃপর বলা হয়েছে, ইমাম বায়হাকী (রহঃ), ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ সবাই বলেছেন যে, এ দান যাকাতের মাল থেকে ছিল না, বরং গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল।

এ পর্যন্ত সদ্কার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হল। এ চারটির অধিকার 'লাম' বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয়খাতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'লাম'-এর পরিবর্তে فى (ফী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ইমাম যামাখ্শারী তাঁর কাশ্শাফ গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয়খাত প্রথম চারটি ব্যয়খাতের তুলনায় বেশী হকদার। কারণ, فى হরফটি পাত্রকে বোঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সদ্কাসমূহ যে সমস্ত লোকের মাঝে রেখে দেয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা, যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকীর-মিসকীনদের তুলনায় অধিক কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে ঋণী এবং পাওনাদাররা তার উপর তাকাদা করছে, সে সাধারণ গরীব-মিসকীন অপেক্ষা অধিক অভাবে থাকে। কারণ, নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশী চিন্তা থাকে তার পাওনাদারদের প্রতি।

আরেকটি ব্যয়খাত হল الْغَارِمِينَ যা غارم এর বহুবচন। এর অর্থ দেনাদার, ঋণী। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যয়খাত যা فى-এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম চারটি ব্যয়খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য কিংবা ঋণগ্রস্তকে তার ঋণমুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকীর-মিসকীনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই غارم (গারেম) বলা

হয়। আবার কোন কোন ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। কোন পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে—যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদীর নাজায়েয প্রথা—অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না; যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা না হয়।

فى سبيل الله এখানে আবারো فى হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তফসীরে-কাশ্‌শাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনরাবৃত্তিতে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এ খাতটি পূর্বোল্লেখিত সব খাত অপেক্ষা উত্তম। তার কারণ এই যে, এতে দু'টি ফায়দা রয়েছে। (১) গরীব-নিঃস্বের সাহায্য এবং (২) একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ فى سبيل الله -এর মর্ম সেসব গাযী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জেহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্ব আদায় করতে পারে। এ দু'টি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খেদমত ও এবাদত। কাজেই যাকাতের মাল এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি এবাদত আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফেকাহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি এবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে।— (যাহেরিয়ার হাওয়ালায় রূহুল-মা'আনী)

বাদায়ে, প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত যে কোন সৎকাজ কিংবা এবাদত করতে চায় যাতে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থ-সম্পদ থাকবে না যদ্দারা সংশ্লিষ্ট সে কাজটি সম্পাদন করতে পারে। যেমন, ধর্মীয় শিক্ষা ও তবলীগ এবং সে জন্য প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতি। কোন যাকাতের হকদার লোক যদি এ কাজ করতে চায়, তবে তাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন মালদার লোককে তা দেয়া যায় না।

উল্লেখিত বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা فى سبيل الله -এর তফসীরে বর্ণনা করা হলো দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোন ধনী সাহেবে-নেসাবের কোন অংশ এতে নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না পারে, যা জেহাদ কিংবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নেসাব পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে—যেমন এক হাদীসেও তাকে غنى (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জেহাদ অথবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফতহুল-কাদীর' গ্রন্থে শাইখ ইবনে-হুমাম (রহঃ) বলেছেন, সদকা সংক্রান্ত আয়াতসমূহে যেসব ব্যয়খাতের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির শব্দ স্বয়ং এর প্রমাণ বহন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতেই হকদার। ফকীর ও মিসকীন শব্দে তো তা সুস্পষ্ট রয়েছেই ; রেকাব, গাবেরীন, ফী-সাবীলিল্লাহ, ইবনুস্‌সাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের অভাব দূর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা عاملين (আমেলীন) যাকাত উসুলকারী— তাদেরকে দেয়া হয় তাদের সেবার বিনিময়ে। সুতরাং এতে আমীর-ফকীর সমান। যেমন, غارمين এর খাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে এবং পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে, তাকে পাঁচ হাজার টাকার যাকাত দেয়া যেতে পারে। কারণ, যে মাল তার কাছে মওজুদ রয়েছে, তা তার ঋণের দরুন না থাকারই শামিল।

জ্ঞাতব্য ঃ فى سبيل الله শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী فى سبيل الله -এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কোরআনকে বুঝতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা فى سبيل الله শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও যাকাতের ব্যয়-খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন কোন দিক দিয়ে সৎকাজ কিংবা এবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা فى سبيل الله -এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয়খাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। সাহাবায়ে-কেরাম, যাঁরা কোরআনকে সরাসরি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট অধ্যায়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজ্বব্রতী ও মুজাহেদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর একটি উট فى سبيل الله (ফী-সাবীলিল্লাহ্) ওয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী (সাঃ) সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে ব্যবহার করো।—(মবসূত ৩, পৃঃ - ১০)

ইমাম ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখ হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারাই কোরআনের তফসীর করেন। তাঁদের সবাই فى سبيل الله শব্দকে এমন মুজাহেদীন ও হজ্বব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে জেহাদ কিংবা হজ্ব করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফেকাহবিদ মনীষীবৃন্দ তালেবে-এলম কিংবা অন্যান্য সৎকর্মীদিগকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকীর ও অভাবগ্রস্তরা নিজেই যাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয়খাত। এদেরকে ফী-সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা যাকাতের হকদার ছিল। কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফেকাহ্‌বিদগণের কেউই একথা বলেননি যে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের যাবতীয় প্রয়োজন যাকাতের ন্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় করা না জায়েয। হানাফী ফেকাহবিদ ইমামগণের মধ্যে শামসুল আয়েম্মা সারাখ্‌সী মবসূত দ্বিতীয় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহে-সিয়ার চতুর্থ খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায়, শাফেয়ী ফেকাহবিদগণের মধ্যে আবু ওবায়েদ 'কিতাবুল-আমওয়াল' গ্রন্থে, মালেকী ফেকাহবিদগণের 'দার্দেজ শরহে মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফেকাহবিদগণের মধ্যে মুত্তাফিক মুগনী গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন।

ابن السبيل (ইবনুস-সাবীল)। سبيل অর্থ পথ। আর ابن অর্থ মূলতঃ পুত্র হলেও আরবী পরিভাষায় ابن - اب ও اخ প্রভৃতি সে সমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এই পরিভাষা অনুযায়ী ابن السبيل বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ, পথ অতিক্রম করা এবং গন্তব্য-স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও অতি নিবিড়। আর যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য; যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয়

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ
أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِن
سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ
نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ الْمُنَافِقُونَ
وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا
اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللَّهُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

(৬২) তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রসূলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী। (৬৩) তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্‌র সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান। (৬৪) মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক ; আল্লাহ্‌ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? (৬৬) ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহ্‌গার। (৬৭) মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শিক্ষায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। (৬৮) ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্‌ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের- তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব।

অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন। এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পারে, যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সক্ষম হবে।

এ পর্যন্ত যাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হল, যা উল্লেখিত আয়াতে সদ্‌কা ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এমন কিছু মাসআলা বর্ণনা করা যাচ্ছে যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মালিকানা ঃ অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকার কল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উম্মাহ্‌র অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের অর্থ মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতাল-এতীমখানা প্রভৃতি নির্মাণ অথবা তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেই ফকীর-মিসকীন ও প্রাপ্ত হয়, যারা যাকাতের খাত হিসাবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতীমখানাগুলোতে যদি মালিকানা স্বত্ব হিসাবে এতীমদের খাওয়া-পরা দেয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হাসপা তালসমূহে সেযব ওষুধ অভাবী গরীবদিগকে মালিকানা অধিকার মোতাবেক দিয়ে দেয়া হয়, তার মূল্যও যাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনিভাবে উম্মাহ্‌র ফেকাহ্‌বিদগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লা-ওয়ারিস মৃতের কাফন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যেতে পারে না। কারণ, মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। তবে যাকাতের অর্থ যদি কোন গরীব হকদার লোককে দিয়ে দেয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা-ওয়ারিস মৃতের কাফনে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েয। তেমনিভাবে যদি সে মৃতর উপর ঋণ থাকে, তবে সে ঋণ সরাসরি যাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তবে তার কোন ওয়ারিস যদি গরীব ও যাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানার ভিত্তিতে তা দেয়া যেতে পারে। তখন সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছায় তদ্দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনিভাবে জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম—যেমন, কূপ খনন, পুল নির্মাণ কিংবা সড়ক তৈরী প্রভৃতি। যদিও এসবের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য লোকেরাও উপকৃত হয়, কিন্তু এতে তাদের মালিকানা, অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

মালিকুল-ওলামা তাঁর 'বেদায়াহ্' গ্রন্থে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, কোরআনে সাধারণতঃ যাকাত ও ওয়াজিব সদকার ক্ষেত্রে **ايتاء** শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ —— اَقَامُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ — وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ — وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۗءِ الزَّكٰوةِ

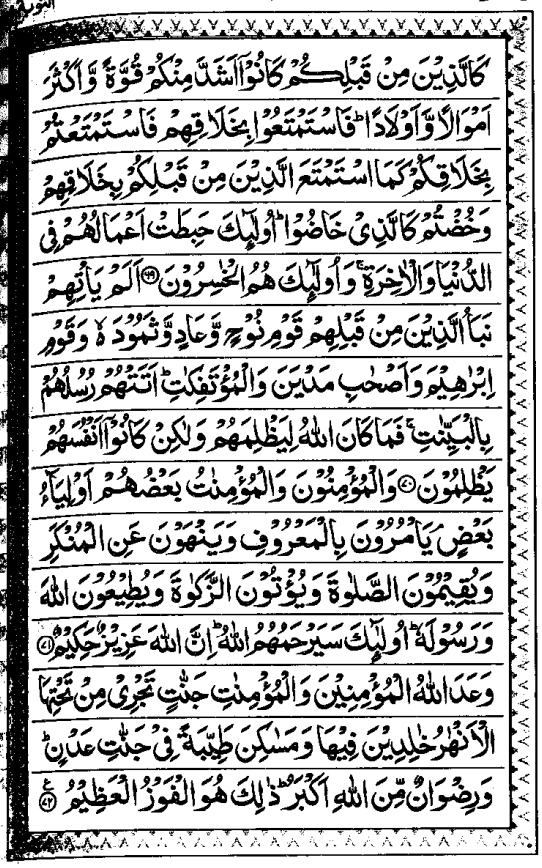

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ
اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ يَاْتِهِمْ
نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ
اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾
وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

(৬৯) যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল শক্তিতে এবং ধন-সম্পদের ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশী ; অতঃপর উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা। আবার তোমরা ফায়দা উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা- যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ফায়দা উঠিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও চলছ তাদেরই চলন অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন। (৭০) তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আ'দের ও সামূদের সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো। (৭১) আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৭২) আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।

প্রভৃতি আর ايتاء শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব ইসপাহানী (রহঃ) 'মুফরাদাতে-কোরআন' গ্রন্থে বলেছেন— والايتاء الاعطاء وخص وضع الصدقة فى القران بالايتاء অর্থাৎ, ঈতা' অর্থ দান করা। আর কোরআনে ওয়াজিব সদকা আদায় করাকে ঈতা শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। 'আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কাউকে কোন কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

তাছাড়া যাকাত ছাড়াও ايتاء শব্দটি কোরআন করীমে মালিক বানিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ অর্থাৎ, স্ত্রীদিগকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহরানা পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে যখন, মোহরের উপর স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন করীমে যাকাতকে 'সদ্‌কা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ আর صدقة (সদ্‌কাহ্)-এর প্রকৃত অর্থ তাই যে, কোন ফকীর-অভাবগ্রস্তকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

কাউকে খাবার খাইয়ে দেয়া কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দেয়াকে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে 'সদ্‌কা' বলা হয় না। শায়খ-ইবনে হুমাম 'ফাতহুল-কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদকার তাৎপর্যও তাই যে, কোন কাফেরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। এমনিভাবে ইমাম জাসসাস 'আহ্‌কামুল-কোরআনে' বলেছেন, 'সদ্‌কা' শব্দটি হল মালিক করে দেয়ার নাম। -(জাসসাস ২য় খঃ ১৫২ পৃঃ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জেহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জেহাদ করার অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জেহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জেহাদ। অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। - (কুরতুবী, মাযহারী)

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - এতে غلظ এর প্রকৃত অর্থ হল এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম রেয়ায়েত বা কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رأفت এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল কোমলতা ও করুণা।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, এক্ষেত্রে غلظت শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বোঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরীয়তের হুকুম জারী করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা নবী-রসূলগণের রীতি বিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— "যদি তোমাদের কোন ক্রীতদাসী যিনায় লিপ্ত হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী তার

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۚ
وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا
بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا
يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ
فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ
اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾
فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾
فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا
اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ
الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۚ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

(৭৩) হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে ; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।

(৭৪) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ্ তাআলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই। (৭৫) তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ্ তাআলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। (৭৬) অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙ্গে দিয়ে। (৭৭) তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘণ করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। (৭৮) তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্ তাদের রহস্য ও সলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়? (৭৯) সে সমস্ত লোক যারা ভৎর্সনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্ৎসনা বা গালাগালি করো না।' – (কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

"আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর রীতি–নীতিতেও কোথাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ –তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক–সমাবেশে কুফরী কথা বার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের সুচিত্র প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের শানে–নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) গযওয়ায়ে তাবুক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) এ ঘটনা মহানবী (সাঃ)–কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উভয়কে 'মিম্বরে–নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে! হযরত আমের (রাঃ)–এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ্, আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীলে–আমীন ওহী নিয়ে হাযির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল।

আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়।—(মাযহারী)

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে-নুযুল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষতঃ এজন্য যে, আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا অর্থাৎ, তারা এমন এক কাজের চিন্তা করল, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি এমন কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যাতে মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বার জন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশে লুকিয়ে বসেছিল যে, মহানবী (সাঃ) যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এব্যাপারে হযরত জিবরীল-আমীন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়।

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্ব কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ এ আয়াতটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে জরীর, ইবনে-আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবাহ্ ইবনে হাতেম আনসারী রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল যে, হুযুর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করে দিলেন। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর নামাযের জন্য সে মদীনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুম'আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রসূলে করীম (সাঃ) একথা শুনে তিন বার বললেন- يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ অর্থাৎ, সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস!

ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদ্কার আয়াত নাযিল হয়, যাতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদ্কা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করিয়ে দুজন লোককে সদকা উসুলকারী বানিয়ে মুসলমানদের পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা'লাবাহ্র কাছে যান। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন।

এরা উভয়ে যখন সা'লাবাহ্র কাছে গিয়ে পৌঁছাল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর লিখিত ফরমান দেখাল, তখন সা'লাবাহ্ বলতে লাগল, এ তো 'জিযিয়া' কর হয়ে গেল, যা অ-মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। এঁরা চলে গেলেন।

আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সাঃ)-এর ফরমান শুনল, তখন নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদকার নেসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রসূল (সাঃ)-এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হাযির হলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বার বার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন।

অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানদের সদকা আদায় করে সা'লাবাহ্র কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এ তো এক রকম জিযিয়া করই হয়ে গেল যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া উচিত নয়। যাহোক, এখন আপনারা যান,আমি পরে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

যখন এরা মদীনায় ফিরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ সা'লাবাহ্র উপর আফসোস!) কথাটি তিন তিন বার বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফেকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

হযরত আবু উমামাহ্ (রাঃ)-এর বিস্তারিত রেওয়ায়েতের পর— যা এইমাত্র উল্লেখ করা হল, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সা'লাবাহ্র জন্য তিন তিন বার আফসোস করেন তখন সে মজলিসে সা'লাবার কতিপয় আত্মীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۭ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً
فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ
خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۭ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ
حَرًّا ۭ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ
جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَاۗىِٕفَةٍ
مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا
وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۭ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ
فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓي اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰي قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا
وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ
اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ
اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

(৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ না-ফরমানদেরকে পথ দেখান না। (৮১) পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্‌র রসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। (৮২) অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে। (৮৩) বস্তুতঃ আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক। (৮৪) আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসুলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা না-ফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। (৮৫) আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ্ তো এই চান যে, এ সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রসুলের সাথে একাত্ম হয়ে, তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি।

এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং তাকে ভৎর্সনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা সা'লাবাহ্ শুনে ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাযির হয়ে নিবেদন করল, হুযুর আমার সদ্‌কা কবুল করে নিন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তোমার সদ্‌কা কবুল করতে বারণ করে দিয়েছেন। একথা শুনে সা'লাবাহ্ নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল।

হুযুর (সাঃ) বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর তোমার সদ্‌কা কবুল হতে পারে না। তখন সা'লাবাহ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা হলে সা'লাবাহ সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তার সদ্‌কা কবুল করার আবেদন জানাল। তিনি উত্তর দিলেন,যখন স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই কবুল করেননি, তখন আমি কেমন করে কবুল করব!

তারপর হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ)-এর ওফাতের পর সা'লাবাহ ফারূকে আযম (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং সে আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলেও সে এ নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই সা'লাবার মৃত্যু হয়। -(মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখেরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহেদীনের তালিকা থেকে কেটে দেয়া এবং পরবর্তী কোন জেহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

مخلفون শব্দটি مخلف এর বহুবচন। অর্থ-'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ, যাকে পরিহার করা বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জেহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জেহাদ 'বর্জনকারী' নয়; বরং জেহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ এতে خلاف অর্থাৎ, 'পেছনে' বা 'পরে'। আবু ওবায়দা (রাঃ) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জেহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। بِمَقْعَدِهِمْ শব্দটি এখানে قعود (বসে থাকা) এর ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خلاف অর্থ مخالفت তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ, এরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করে

ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও এ কথাই বোঝাল যে, لَاتَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ অর্থাৎ, (এমন) গরমের সময়ে জেহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ, এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুতঃ এর ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের না-ফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশী? অতঃপর বলেন–

... فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম, কাঁদো বেশী'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ, নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فاذا انقطعت الدنيا وصاروا الى الله فليستأنفوا البكاء لاينقطع ابدا "দুনিয়া সামান্য কয়েক–দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।" — (মাযহারী)

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে لَنْ تَخْرُجُوْا এর মর্মার্থ এই যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জেহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী (সাঃ)–এর প্রতি নির্দেশ হল যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জেহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জেহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়।

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে আলোচ্য সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, আলোচ্য ৮৪ তম এ আয়াতটি মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সহীহাইন (অর্থাৎ, বোখারী ও মুসলিম)–এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তার জানাযায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামায পড়েন। নামায পড়ার পরই এ আয়াত নাযিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েননি।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)–এর বর্ণনায় এ আয়াত নাযিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা'হল এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ্ যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন হুযুর (সাঃ)–এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুযুর, আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রসূলে করীম (সাঃ) নিজের জামা মোবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। হুযুর (সাঃ) তাও কবুল করেন। জানাযার নামাযে দাঁড়ালে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হুযুর (সাঃ)–এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনাকে মুসাফিকের নামায পড়তে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছেন—মাগফেরাতের দোয়া করব অথবা করব না। আর সে আয়াতে যাতে সত্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করলেও ক্ষমা হবে না বলে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সত্তর বারের বেশীও ইস্তেগফার করতে পারি। সে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূরা তওবার ঐ আয়াত যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ ..... (সুতরাং এরপর কখনও তিনি কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।)

উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই এর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মোবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।

উত্তর এই যে, এর দু'টি কারণ থাকতে পারে ঃ (এক) তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন তাঁর আবেদন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন। (দুই) অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কোরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)–এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। হুযুর (সাঃ) দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদিগকে বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মত লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সে এহ্সানের বদলা হিসাবেই মহানবী (সাঃ) নিজের জামা মোবারকখানা তাকে দিয়ে দেন। (কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারুকে আযম (রাঃ) যে মহানবী (সাঃ)–কে বললেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মুনাফিকদের নামায পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? কারণ, ইতিপূর্বে কোন আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর বারণের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ ..... । থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাযের বারণের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, তবে মহানবী (সাঃ) এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না

কেন? বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে।

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলীর বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তর বারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বোঝাবার জন্য নয়, বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফেরাত হবে না, যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুযূরকে বারণ করা হয়নি। কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে যা সূরা ইয়াসীনে উক্ত হয়েছে তাতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)–কে দ্বীনের তবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি, বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয় – بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অথবা اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রভৃতি।

সারকথা এই যে, ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ আয়াতের দ্বারা তো মহানবী (সাঃ)–কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে ভীতি–প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাদের মাগফেরাত হবে না। কিন্তু অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাঁকে ভীতি–প্রদর্শনেও বাধা দেয়া হয়নি।

আর মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, তার জামার কারণে কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফেরাত হবে না, কিন্তু এতে অন্যান্য দ্বীনী কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্যান্য কাফেররা যখন হুযূর (সাঃ)–এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে, তখন তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু (মুনাফেকের) জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়েছেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সত্তর বারের বেশী দোয়া ও মাগফেরাত কামনায় তার মাগফেরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম।— (কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সে হাদীস যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোন কোন তফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হুযূর (সাঃ)– এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তার এ কাজের দরুন এই মুনাফেকের মাগফেরাত তথা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলীতে বাহ্যতঃ এই অধিকার দেয়া হয়েছিল; অন্য কোন আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপর দিকে একজন কাফেরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্যান্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, কাজেই তিনি নামায পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারূকে আ'যম (রাঃ) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফেরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাযে জানাযা পড়ে মাগফেরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুওয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রসূলে মকবুল (সাঃ) যদিও এ কাজটিকে মূলতঃ কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যান্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রসূলে করীম (সাঃ)–এর কাজের উপর কোন আপত্তি থাকে, না ফারূকে আ'যম (রাঃ–এর কথায় কোন প্রশ্ন উঠতে পারে।— (বয়ানুল– কোরআন)

মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফেরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা যেয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের কোন কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোন ওলী–ওয়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান অত্মীয় সুন্নত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁততে পারে।—(বয়ানুল– কোরআন)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফেকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফেকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নেয়ামত পাবে?

এর উত্তরে ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি কোন রহমত ও নেয়ামত নয়; বরং পার্থিবজীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাববিশেষ। আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন–সম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা–ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম–আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধন–সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এ সমস্ত ধন–সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

اُولُوا الطَّوْلِ শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সম্পন্ন নয় অর্থাৎ, যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক ওযরও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)।

رَضُوا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۚ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾ وَ
جَاۗءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ
كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاۗءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ ۭ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾
وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ
مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ
حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ
يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاۗءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا
مَعَ الْخَوَالِفِ ۚ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

(৮৭) তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না। (৮৮) কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। (৮৯) আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা। (৯০) আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীগ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের। (৯১) দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯২) আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বেদুইন যাযাবরদের মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। (এক) যারা ছল-ছুতা পেশ করার জন্য মহানবী (সাঃ)- এর খেদমতে হাযির হয় যাতে তাদেরকে জেহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন জাদ্দ ইবনে কায়েসকে জেহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন কতিপয় মুনাফেকও খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছল-ছুতা পেশ করে জেহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওযর পেশ করছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওযর কুফরী ও মুনাফেকীর কারণে ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফেরদের আযাবের আওতাভুক্ত নয়।

বিগত আয়াতসমূহে এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে জেহাদে অংশগ্রহণে অপারগ ছিল না, কিন্তু শৈথিল্যবশতঃ অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফেকরা বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরী ও কুটিলতা হেতু নানা রকম ছলছুতার আশ্রয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত দর্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত থেকে গেছে। এদের অপারগ না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আযাব হওয়ার ব্যাপারটি বিগত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে।

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপরাগতার দরুন জেহাদে অংশ গ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারগ এবং যাদের অপারগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জেহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুতঃ সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জেহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপরাগতার কথা জানিয়ে রসূলে করীম (সাঃ) - এর নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা হোক।

তফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রসূলে করীম (সাঃ) তাদের কাছে নিজের অপারগতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারী বা যানবাহনের কোন ব্যবস্থ নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই হুযুর (সাঃ) - এর নিকট ছয়টি উট এসে যায় এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন।—(মাযহারী) তাদের মধ্যে তিন

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا
تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَ
سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٩٤ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ
لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ
اِنَّهُمْ رِجْسٌ ؗ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩٥
يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝٩٦ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ
نِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٩٧ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ
دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٩٨ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ
يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ
عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٩٩ ع

(৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল কারো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ্ই দেখবেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনি-ই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (৯৫) এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহ্র কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর– নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। (৯৬) তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ্ তা'আলা রাযী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি। (৯৭) বেদুইনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ্ তা' আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। (৯৮) আবার কোন কোন বেদুইন এমনও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক ! আর আল্লাহ্ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (৯৯) আর কোন কোন বেদুইন হল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর, কেয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো ! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

জনের সওয়ারীর ব্যবস্থা করেন হযরত ওসমান গনী (রাঃ)। অথচ ইতিপূর্বে তিনি বিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা নিজ খরচে করেছিলেন।

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্তও কোন সওয়ারীর ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে তারা জেহাদে বিরত থাকে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের অপরাগতা আল্লাহ্ কবূল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জেহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে নিয়েছে। اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ - এর মর্মও তাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফেকের আলোচনা ছিল যারা গযওয়ায়ে তাবুকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দর্শিয়ে জেহাদে যাওয়া থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লেখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জেহাদ থেকে ফিরে আসার পর রসূলে করীম (সাঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জেহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনায় তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফেকরা ওযর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুতঃ ঘটনাও তাই ঘটে।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে—(এক) যখন এরা আপনার কাছে ওযর-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, খামাখা মিথ্যা ওযর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দুষ্টামী এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন রকম ওযর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন! তারপর বলা হয়েছে– وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ এতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, এখনও যেন তারা মুনাফেকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ, এতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন্ ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তোমাদের কোন উপরকারই সাধন করবে না।

(দুই) ৯৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ, আপনি যেন তাদের জেহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সেজন্য যেন কোন ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই বাসনা পূরণ করে দিন। فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ, আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ, ভর্ৎসনা করে কোন ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করে

কি হবে। খামাখা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

(তিন) ৯৬ নং আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাযী করাতে চাইবে। এ বাপারের আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাযী হবেন না। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাযী হয়ে গেলেন বলে ধরেও নেয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবে না এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরী ও মুনাফেকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ্ তাআলা কেমন করে রাযী হবেন!

اعراب শব্দটি عرب শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদ বিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর এক করতে হলে اعرابى বলা হয়। যেমন, انصار – এর এক বচন, انصارى হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও মুনাফেকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশী কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা এলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা, কঠোরতায় ভুগতে থাকার দরুন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে। وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ অর্থাৎ, এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ, না কোরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৯৮ নং আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য নামাযও পড়ে নেয় এবং ফরয যাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন রকমে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। الدَّوَائِرَ শব্দটি دائرة- এর বহুবচন। আরবী অভিধান অনুযায়ী دائرة (দায়েরাহ্) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভাল অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কোরআন করীম তাদের উত্তরে বলেছে عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ, তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনার কোরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সংগত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা যে সদকা-যাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দোয়াপ্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে।

সদ্‌কা যে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কোরআন-করীমে যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে – خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সদকা উসূল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صلوة শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দোয়াকে صلوة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ۝ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ
اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَي النِّفَاقِ ۡ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ
نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝
وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۭ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ خُذْ
مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ
اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ
اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ
لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(১০০) আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (১০১) আর কিছু কিছু তোমার আশ-পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনড়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু' বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে। (১০২) আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১০৩) তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন। (১০৪) তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই তওবা কবুলকারী, করুণাময়। (১০৫) আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে। (১০৬) আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহ্র নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে; তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ বাক্যটিতে ব্যবহৃত من অব্যয়কে অধিকাংশ তফসীরবিদগণ تبعيض – এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজেরীন ও আনসারদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং (২) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।

এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে سابقين اولين তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা (অর্থাৎ, বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্) এর দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ, যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন তাঁদেরকে سابقين اولين গণ্য করেছেন। এমনটি হল সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও কাতাদাহ্ (রাঃ)–এর। হযরত আ'তা ইবনে আবী রাবাহ্ বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (রাঃ)-এর মতে যেসব সাহাবী হোদায়বিয়ার বাইআতে–রেদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্তুতঃ প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবাগণ মুহাজির হোক বা আনসার–সাবেকীনে আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। (কুরতুবী, মাযহারী)

তফসীরে–মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে من অব্যয়টি আংশিককে বোঝাবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়নি; বরং বিবরণের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। আর سابقين اولين হল তার বিবরণ। —'বয়ানুল–কোরাআন' থেকে তফসীরের যে সার–সংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দু'টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে রেদওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন তাঁদের; আর দ্বিতীয় তফসীরের মর্ম হল এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ, যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তফসীর অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে হোদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের, যারা কেয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تابعى (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কেয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا
رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
يُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

(১০৭) আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। (১০৮) তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (১০৯) যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ্ জালেমদের পথ দেখান না। (১১০) তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ-প্রজ্ঞাময়।(১১১) আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে: অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত :

মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রাঃ)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন— যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোত্থেকে বলছেন (এর প্রমাণ কি)? তিনি বললেন, কোরআন করীমের আয়াত পড়ে দেখ। وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ – এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اتباع باحسان -এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিধন্য হবেন।

তফসীরে-মাযহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্য্যায়ের, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে।—(তিরমিযী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ যে দশ জন মুমিন বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا আয়াতে। বাকী তিন জনের হুকুম রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং এখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়।– (বোখারী, মুসলিম)।

মসজিদে যেরার : মদীনায় আবু আ'মের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবু আ'মের পাদ্রী নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রাঃ) যাঁর মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও খ্রীষ্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবু আ'মের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু

তাতে সেই হতভাগার সান্ত্বনা আসলো না। অধিকন্তু সে বলল, "আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হোনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ, তখন এটি ছিল খ্রীষ্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল, তা সে ভোগ করলো। আসলে লাঞ্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লাঞ্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোম সম্রাটকে মদীনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের উৎখাত করার প্ররোচনাও দিয়েছিল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফেকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলমানদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।"

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফেক মদীনার কোবা মহল্লায়, যেখানে হুযুরে আকরাম (সাঃ) হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন— আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইস্হাক (রহঃ) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যাহোক অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রসূলে করীম (সাঃ) তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামায আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে যেরার সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রসূলে করীম (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে— যাদের মধ্যে আমের বিন সকস্ এবং হযরত হামযা (রাঃ)-এর হন্তা 'ওয়াহশী'ও উপস্থিত ছিলেন— এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তাঁরা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।

তফসীরে-মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) মদীনা পৌঁছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ'দীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, যে জায়গা সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগদখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখীকুল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে ওরাও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমতঃ ضِرَارًا অর্থাৎ, মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ضرار ও ضرر শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে ভাষাবিদগণ এ শব্দ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, ضرر সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক; আর ضرر হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। যেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে মারাত্মক ضِرَارًا পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضرار শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। একটি দল যে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ অর্থাৎ, সেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কোরআন মজীদ 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী (সাঃ)-এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলতঃ মসজিদই ছিল না, তা নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, যা কোরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোন মসজিদের মোকাবেলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তিকরণ ও পূর্বতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার সওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েয হবে না। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলতঃ গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামায আদায় করবে, তাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশে

মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের সওয়াব সে পাবে বরং গুনাহ্গার হবে; কিন্তু একে আয়াতে উল্লেখিত 'মসজিদে যিরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে যিরার' বলে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে যিরার এর মত' বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত রাখা যেতে পারে। যেমন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এক আদেশ জারী করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাআত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। – (কাশ্শাফ)

উপরোক্ত 'মসজিদে যিরার' সম্পর্কে ১০৮ নং আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাযের উদ্দেশে দাঁড়ানো। অর্থাৎ, আপনি এই তথাকথিত মসজিদে কখনো নামায আদায় করবেন না।

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, আপনার নামায সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথমদিন থেকে তাকওয়া বা খোদাভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামায আদায় করে, যারা পাকপবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুতঃ আল্লাহ্ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, প্রশংসিত সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী (সাঃ) তখন নামায আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (তফসীরে মাযহারী)

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী (সাঃ)-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ্ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লীগণ সাধারণতঃ এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

১১১তম আয়াতের শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ মুফাসসেরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'বায়আতে আকাবায়' অংশ গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ' বায়'আত নেয়া হয়েছিল মক্কায় মদীনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদনী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বোঝায় মিনার জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেয়া হয়েছে। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় বায়আত নেয়া হয়। প্রথম দফা নেয়া হয় নবুওয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদীনা ফিরে যান। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম (সাঃ)-এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজ্বের মৌসুমে বার জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচ জন ছিলেন পূর্বের এবং সাত জন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, চল্লিশ জনেরও বেশী। তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কোরআনের তালীম দানের উদ্দেশে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মোসআব বিন ওমাইর (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কোরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে মদীনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবুওয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়'আতে আকাবা। সাধারণতঃ বায়'আতে আকাবা বলতে একেই বোঝানো হয়। এ বায়'আতটি ইসলামের মৌল আকীদা ও আমল, বিশেষতঃ কাফেরদের সাথে জেহাদ এবং মহানবী (সাঃ) হিজরত করে মদীনা গেলে তাঁর হেফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নেয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ) বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখন অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হোক। হুযূর (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্র ব্যাপারে শর্তারোপ করেছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই এবাদত করবে; তাঁকে ছাড়া কারো এবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাযত কর। তাঁরা আরয করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাযী, এমন রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোন দিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

জেহাদের সর্বপ্রথম আয়াত ঃ মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জেহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় ঃ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ (সূরা হজ্ব ৩৯) মক্কায় কোরাইশ বংশীয় কাফেরদের অগোচরে যখন বায়'আতে আকাবা সম্পাদিত হয় তখনই মহানবী (সাঃ) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশঃ সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) নিজে আল্লাহ্র অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মত নিবৃত রাখেন। – (মাযহারী)

فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ থেকে يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জেহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাযিল হয়েছিল। ইঞ্জিল (বাইবেলে) জেহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবতঃ এজন্য যে, পরবর্তী খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জেহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায় – 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ'। فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ বায়'আতে আকাবায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মত। তাই আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল

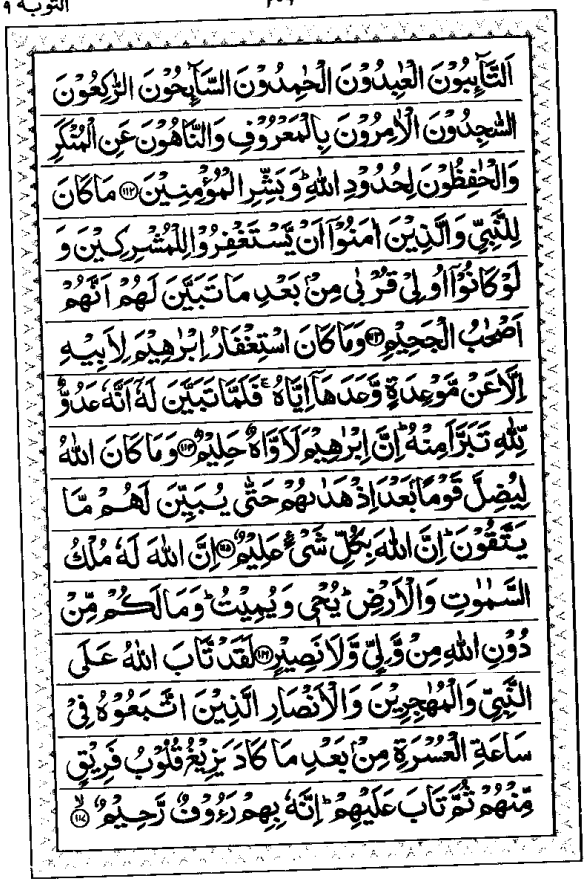

يعتذرون ١١ ٢٠٧ التوبة ٩

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ
لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا
يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن
دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ
مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

(১১২) তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকূ ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। (১১৩) নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক– একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। (১১৪) আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল। (১১৫) আর আল্লাহ্ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না – যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। (১১৭) আল্লাহ্ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।

হলো আল্লাহ্‌রই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদিগকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ্।' হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, 'লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ্ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে – 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন।' আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর التَّائِبُونَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ,. আল্লাহ্‌র রাহে কেবল জেহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। বিশেষতঃ বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাসসেরের মতে السَّائِحُونَ এর অর্থ صائمون অর্থাৎ রোযাপালনকারী। শব্দটি سياحت (দেশ ভ্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলাম-পূর্ব যুগে খ্রীষ্ট ধর্মে দেশ ভ্রমণকে এবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ, মানুষ পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোযা পালনের এবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ। অথচ রোযা এমন এক এবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়ায়েতে জেহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সহী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হুযুরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, سياحة امتى الجهاد فى سبيل الله অর্থাৎ, 'আমার উম্মতের দেশভ্রমণ হলো জেহাদ ফীসাবীলিল্লাহ্।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোরআন মজীদে ব্যবহৃত سائحين শব্দের অর্থ রোযাদার। হযরত ইকরিমা (রাঃ) سائحين শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো এলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী, যারা এলম হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ যথাঃ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ উল্লেখ করে অষ্টম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ, সাতটি গুণের মধ্যে যে তফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এঁরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরীয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাযতকারী।

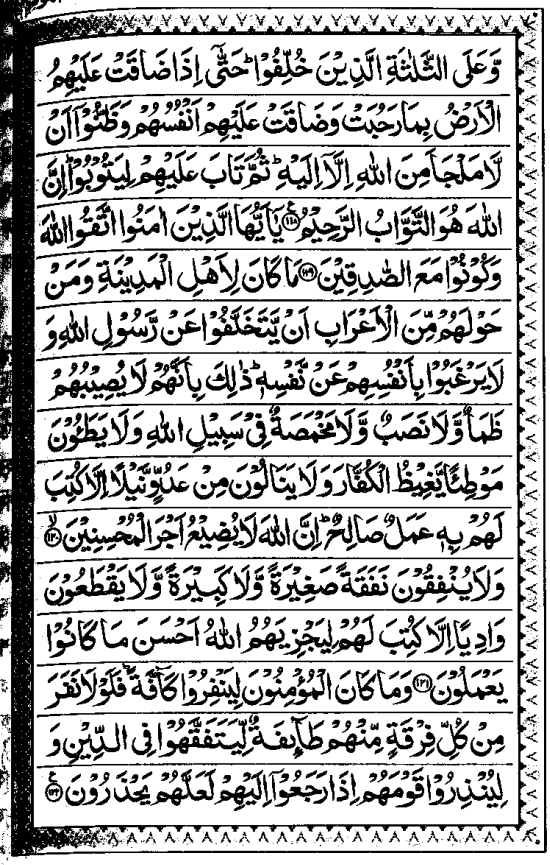

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ حَتّٰٓي اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ
لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ
حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ
لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ
ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ
مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾
وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ
وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۗفَّةً ۭ فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۗىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ
لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

(১১৮) এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই—অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দয়াময় করুণাশীল। (১১৯) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (১২০) মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্‌র পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যাকিছু প্রাপ্ত হয়—তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (১২১) আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। (১২২) আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?

فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ কোরআন মজীদ তাবুক যুদ্ধের সময়টিকে 'সঙ্কটকময় মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছে। কারণ, সে সময় মুসলমানগণ বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালা করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ আয়াতের এ বাক্যে যে, কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়, বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের স্বল্পতা হেতু সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জেহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাঁদের অপরাধ। যেজন্য তাঁরা তওবা করেন এবং তা কবুল হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا এখানে خلفوا অর্থ যাদের পেছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হল। এঁরা তিন জন হলেন হযরত কা'আব ইবনে মালেক, শা-এর মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) তাঁরা তিন জনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতিপূর্বে বায়'আতে আ'কাবা ও মহানবী (সাঃ)-এর সাথে বিভিন্ন জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফেকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো। অতঃপর যখন হুযুরে আকরাম (সাঃ) জেহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফেকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর মহানবী (সাঃ)—ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহ্‌র সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হুযুর (সাঃ)-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জেহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহ্‌র নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে, অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কোরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সুরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ - عَلَيْهِمْ دَاۗىِٕرَةُ السَّوْءِ পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাযিল হয় তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জেহাদ থেকে বিরত থাকার যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠবান সাহাবীর দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তওবা কবুল হলো,

এ ছিল তাঁদের তাকওয়া ও খোদাভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ' আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হেদায়েত দান করা হয়েছে। আর وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক।) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ঐ সকল সাহাবীর পদস্খলনের মধ্যে মুনাফেকদের সাথে উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোরআনের এ আয়াতে আলেম ও সালেহ্‌গণের পরিবর্তে 'সাদেকীন' শব্দ ব্যবহার করে আলেম ও সালেহ্‌-এর প্রকৃত পরিচয় দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই যথার্থ সালেহ্‌ বা নেককার যে ভেতরে ও বাহিরে সমান এবং নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়।

দ্বীনের এলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম ঃ

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি দ্বীনের এলম হাসিলের মৌলিক দলীল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দ্বীনী এলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী এবং এলম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দ্বীনী এলমের ফযীলত ঃ দ্বীনী এলমের অগণিত ফযীলত ও সওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ছোট বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে আবুদ্দারদা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্ত এলম হাসিল করার উদ্দেশে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ্‌ এই চলার সওয়াব হিসাবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ দ্বীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল এবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলেমসমাজ নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ স্বর্ণ, রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে এলমের মীরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি এলমের মীরাস পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করলো।— (কুরতুবী)

ইমাম দারেমী (রহঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। বনী-ইসরাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামায ও লোকর দ্বীনী তা'লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত এবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দু'জনের মধ্যে কার ফযীলত বেশী?' হুযূর (সাঃ) বলেন, সেই আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর।— (কুরতুবী)

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফেকাহ্‌বিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারী।— (তিরমিযী, মাযহারী) তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। (এক) সদকায়ে জারিয়া—(যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)। (দুই) এলম-যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে এলমে দ্বীনের চর্চা জারী রাখা বা কোন কিতাব লিখে যাওয়া।) (তিন) নেককার সন্তান—যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।— (কুরতবী)

দ্বীনী এলম ফরযে-আইন অথবা ফরযে-কেফায়া হওয়ার বিবরণ ঃ

ইবনে আ'দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন- طلب العلم فريضة على كل مسلم 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর এলম শিক্ষা করা ফরয।' বলাবাহুল্য, এ হাদীসও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লেখিত 'এলম' শব্দের অর্থ দ্বীনের এলম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দ্বীনী এলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বোঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লেখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর যে এলম তলব ফরয করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দ্বীনী এলমের শুধু সে অংশই আয়ত্ত করাই ফরয করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরযসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাঁচতে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়; কোরআন-হাদীসের মাসআলা-মাসায়েল, কোরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরযে-আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরযে কেফায়াহ্‌। তাই প্রত্যেকটি শহরেই যদি শরীয়তের উপরোক্ত এলম ও আইন-কানুনের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যখান থেকে কোন আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরয। যাতে করে যে কোন প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমত আমল করা যায়। দ্বীনী এলম সম্পর্কে ফরযে-আইন ও ফরযে-কেফায়ার তফছীল নিম্নরূপ ঃ

ফরযে-আইন ঃ ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামায-রোযা ও অন্যান্য এবাদত বা শরীয়ত যেসব বিষয় ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মকরূহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, তার জন্য যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্ব আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার আহ্‌কাম ও মাসায়েল জেনে নেয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা-বেচা বা শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয। এক কথায় শরীয়ত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাসআলা- মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।

এলমে-তাসাউফ ও ফরযে-আইনের অন্তর্ভুক্ত ঃ শরীয়তের যাহেরী হুকুম তথা নামায-রোযা প্রভৃতি যে ফরযে-আইন

সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর এলম রাখাও ফরযে-আইন। হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরযে-আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর এলম-যাকে পরিভাষায় 'এলমে-তাসাউফ' বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরযে-আইন।

অধুনা বিভিন্ন এলম., তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্ফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে এলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরযে-আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বোঝায়, যা ফরয-ওয়াজিবের তফসীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এর বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরয, কিংবা গর্ব-অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কোরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। এ সকল বিষয়ের উপরই হল এলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরযে আইন।

ফরযে কেফায়া ঃ পূর্ণ কোরআন মজীদের অর্থ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বোঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা, কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহেদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরীয়ত একে ফরযে-কেফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমত এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যান্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বীনী এলমের সিলেবাস ঃ কোরআন মজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দ্বীনী এলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ অথচ يتعلمون الدين (যেন দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে) ও বলা যেত। কিন্তু কোরআন এখানে تعلم এর স্থলে تفقه শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দ্বীনের এলম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরাও তা পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে; বরং এলমে দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تفقه শব্দের অর্থও তাই। এটি فقه থেকে উদ্ভূত। فقه অর্থ বোঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদ এ আয়াতে صيغه مجرد ব্যবহার করে لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (যেন তারা দ্বীনকে বোঝে নেয়) বলেনি; বরং একে باب تفعل এ নিয়ে لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে ব্যক্যের মর্ম হবে "তারা যেন দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলাবাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাকেই দ্বীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না। বরং দ্বীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বোঝে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে। দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে—মূলতঃ এ চিন্তাই হলো দ্বীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) 'ফেকাহ্'-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা'হলো এই যে, "ফেকাহ্ সে শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বোঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বোঝে নেয় যা' থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরী।" অধুনা মাসআলা-মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে, 'এলমে-ফেকাহ্' বলা হয় তা' পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফেকাহ্র তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দ্বীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় দ্বীনের এলম হাসিল করার অর্থ হলো, দ্বীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হোক-সবই একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ঃ দ্বীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ (যেন তারা জাতিকে আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে ভয়প্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য যে, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে انذار বা ভয়প্রদর্শন। এটি انذار -এর শাব্দিক তরজমা, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুতঃ ভয়প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতিপ্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত, শত্রু, হিংস্রজন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয়প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো, পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয়প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয়প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবীতে একেই বলা হয় انذار - এজন্য নবী-রসূলগণ نذير উপাধীতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে ভয়প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলতঃ নবীগণের আংশিক মীরাস-যা হাদীসমতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নবীগণ بشير ও نذير উভয় উপাধিতেই ভূষিত। نذير এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর بشير অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলীলের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেককার বান্দাদিগকে সুসংবাদ দেয়া। তবে এখানে শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দু'টি। (এক) দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং (দুই) অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেমও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ
الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ
أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ
رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ
أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ
نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ
انصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

(১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। (১২৫) বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো। (১২৬) তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা; দু' একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। (১২৭) আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না— অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ্ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (১২৯) এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও., আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল জেহাদের প্রেরণা। আলোচ্য ১২৩ তম আয়াত থেকে ১২৭ তম আয়াতের প্রথম আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا – এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। তবে কোন্ নিয়মে তাদের সাথে জেহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ করবে। নিকটবর্তী দু'রকমের হতে পারে। (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ, যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ কর। (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জেহাদ চালিয়ে যাও। কারণ, ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কোরআনে রসূলে করীম (সাঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে – وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, "হে রসূল, নিজের নিকটাত্মীয়গণকে আল্লাহ্র আযাবের ভয়প্রদর্শন করুন।" তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ্র বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের কাফের তথা বনু-কোরাইযা, বনু-নযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বোঝাপড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জেহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জেহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً – غِلْظَةً অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا বাক্য থেকে বোঝা যায়, কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ, ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফরমাঁবরদারী সহজ হয়ে উঠে। এবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ্ ও মুনাফেকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরীর তীব্রতার সাথে সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কাল হয়ে যায়। – (মাযহারী) এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেনঃ আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দ্বীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফেকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি-মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোন বিশেষ সংখ্যা